পরিচয়

লাম কুদ্দুস :: সম্পাদক :: সরোজকুমার দত্ত

শান্তির রণকৌশল—ইলিয়া ইরেনবুর্গ ... ১ পৃষ্ঠা
প্রেমপত্রী—অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ ... ... ১০ „
থা—উমানাথ ভট্টাচার্য ... ... ১৯ „
মহান চীনা জনগণ জিন্দাবাদ—এ. ফাদেয়েভ ... ৩৫ „
শান্তি চাই—বিমলচন্দ্র ঘোষ ... ... ৪১ „
নভেম্বরের স্মরণীয় রাত—মুকুল ভট্টাচার্য ... ৪৬ „
শান্তি আশু—ধনঞ্জয় দাস ... ... ৪৭ „
মাংস-লোলুপদের প্রতি—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ... ৪৯ „
"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা"—নীরেন্দ্রনাথ রায় ৫৩ „
মহাচীনের শিল্পীদের জয়যাত্রা—শরৎ চ্যাটার্জী ... ৭৬ „
পুস্তক-পরিচয় ... ... ৮৩ „
লেখকদের প্রতি ... ... ৯০ „
তির উপর আঘাত ... ... ৯৩ „

নব পর্যায় : চতুর্থ সংখ্যা চৈত্র : ১৩৫৬

দাম : আট আনা

পরিচয়

চৈত্র : ১৩৫৬

শান্তির রণকৌশল

[গত ১৫ ই থেকে ১৯ শে মার্চ সুইডেনের রাজধানী স্টকহমে স্থায়ী বিশ্বশান্তি কমিটির গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় বৈঠক বসে এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনের নূতন পর্যায় ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা চলে। বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে ইলিয়া ইরেনবুর্গ শান্তির নবপর্যায় সম্পর্কে যে মূল্যবান বক্তৃতা করেন আমারা সেটা 'পরিচয়ে'র পাঠকদের কাছে পেশ করছি।—সম্পাদক

প্রিয় বন্ধুগণ,

ইউরোপের এই অন্যতম অতি সুন্দর শহর স্টকহমের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমরা প্রত্যেকেই সম্ভবত প্রায়ই ভাবি শান্তি জনগণের সৃজনমূলক প্রতিভাকে কিভাবে সাহায্য করে। সুইডিসরা দ্বাদশ চার্লসের তলোয়ারের চাইতে বহুদিন থেকেই কুড়াল এবং শাবল এবং কম্পাস পছন্দ করে আসছে। যে শহরে আমরা সভা করছি মানুষ তা প্রকৃতির কাছ থেকে এবং কঠিন দুর্জ্জয় পর্বতশিখরের কাছ থেকে নিয়েছে ছিনিয়ে। এ এক দারুণ জয়। এবং সমস্ত মানুষ এমনিধারা রক্তপাতহীন জয়ের পথে অগ্রসর হোক আমরা এই আশাই করি।

এ কথা বোঝা সহজ সুইডেনে কেন যুদ্ধের সমর্থক নেই। কিন্তু আমার ভয় হয়, কিছু কিছু সুইডিস আছে যারা শান্তিকে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করলেও যাদের এখনো শান্তির সমর্থক বলা চলে না।

আমরা বেশ ভালো জানি, শান্তির আকাঙ্খা থাকাটাই যথেষ্ট নয়, কেমন ক'রে শান্তিকে রক্ষা করতে হয় সেটাও জানা দরকার।

অসলো এবং কোপেনহ্যাগেনের অধিবাসীরা স্টকহমের লোকের চাইতে

শান্তিকে কম ভালোবাসত না, কিন্তু তা স্টকহমের কিছু নাগরিকের শান্তির প্রতি ভালোবাসার মতই নিষ্ক্রিয় ভালবাসা। (এখানে লেখক নরওয়ে এবং ডেনমার্কের আটলান্টিক প্যাক্টে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত করেছেন—অনুবাদক)।

ইতিহাসকে যদি অর্থহীন লটারী হিসেবে দেখা হয় তা'হলে মনে হবে, সুইডেন দুইবার লটারীতে জিতেছে (অর্থাৎ সুইডেনকে গত দুইটি মহাযুদ্ধের একটিতেও জড়িত হ'তে হয়নি—অনুবাদক)। ডেনমার্ক ও নরওয়ে একবার হঠাৎ লটারীতে জিতলেও আর একবার ঠিক তেমনি আকস্মিকভাবে হেরে গেছে।

অবশ্য আমি মনে করি না সুইডেনের স্থাপত্যশিল্পীরা এবং লোহা-ইস্পাত কারখানার মজুররা এবং সুইডেনের ছেলেমেয়েদের মায়েরা কখনো ইতিহাস, ভবিষ্যত এবং তাদের শহরনগর সন্তানদেরকে এইভাবে দেখলে সন্তুষ্ট হবে।

কারণ খুব সম্ভব দু'বার জেতার পর তৃতীয়বারে হারতে হ'তে পারে। এবং এখন সে কথাটা শান্তিপূর্ণ মেহনতী সুইডিসবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাবতে শুরু করেছে। শান্তিকে মূল্যবান মনে করাই যথেষ্ট নয়। শান্তিকে রক্ষা করতে হবে।

আমাদের প্যারিস শান্তি সম্মেলনের পর এক বৎসর কেটে গেছে। শান্তি সমর্থকদের শক্তি বেড়ে গেছে। শক্তি এতটা বেড়েছে যে, যুদ্ধের উস্কানীদাতারা দ্বিগুণ জোরে মিথ্যাপ্রচার এবং দশগুণ জোরে জোর জবরদস্তি চালাতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য, শান্তি সমর্থকদের শক্তি এখনো এতটা বাড়েনি যাতে যুদ্ধের উস্কানীদাতাদের বাধ্য করাতে পারে তাদের বর্বর চক্রান্তের পথ পরিত্যাগ করতে।

আমরা আমাদের মহান শান্তি সংগ্রামের চরম পর্যায়ে প্রবেশ করছি। আমাদের সন্তান সন্ততিরা হয় আমাদের সাফল্যময় সংগ্রামকে অভিনন্দিত করবে, নয় আমাদের নিষ্ফল চেষ্টাকে উপহাস করবে। শান্তিসংগ্রামের ফলাফল এখন আমাদের উপর নির্ভর করে। চিরন্তন অভ্যাস, আত্মসন্তুষ্টি এবং মাথা-গরম করার বিপদ অত্যন্ত বেশী।

বিপদ এইখানে যে দিনের পর দিন বোমা এবং মহা-বোমার কথা পড়তে পড়তে লোকে রক্তপিপাসু দানবদের চিৎকারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে ভাবে, জীবনের সঙ্গে এটা বুঝি অবশ্যম্ভাবীরূপে জড়িত। এতে উটপাখীদের মনে আশার সূচনা হয়। এই সংকীর্ণমনা ফিলিস্টাইনের দল বলে :

"এটাই প্রথম বছর নয় যখন ওরা যুদ্ধ সম্পর্কে লিখছে, এবং এখনো যুদ্ধ হ'য় নি। কাজেই—যুদ্ধ কখনো হবে না।"

এতে আবার হতাশারও সৃষ্টি করে—যে-হতাশা উপরে উল্লিখিত উটপাখীদের আশাবাদের মতই অর্থহীন। এই সংকীর্ণমনা বিষণ্ণ প্রকৃতির লোকেরা ভাবে :

> "যদি যুদ্ধ সম্পর্কে এতকথা বলা-হচ্ছে তবে তার মানে দাঁড়ায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী—হয় এক বছর আগে অথবা একবছর পরে। আমি একজন সামান্য মানুষ রাম বা রহিম, আমি কি করতে পারি? সবচেয়ে ভালো, একটা-দু'টো বছর চুপচাপ কাটানো এবং তারপর—তারপর যা আসে আসুক।"

যুদ্ধবাদীদের শক্তি হল এই জায়গায় যে, অনবরত যুদ্ধের কথা বলে তারা লোককে গোলমালে ফেলে দেয়—রাস্তার লোককে তারা হয় বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয় বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, যুদ্ধ হবেই। আমাদের কর্তব্য হ'ল, সরল আত্মসন্তুষ্টি ভেঙে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে সব কিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ভাবকে জয় করা।

আমাদের দুনিয়া ভর সাধারণ লোককে বোঝাতে হবে যে, কেবল তাদের উপরেই যুদ্ধ অথবা শান্তির ব্যাপারটা নির্ভর করছে। সত্যি কথা বলতে কি, যুদ্ধে কূটনৈতিক ব্যক্তি বা এমন কি জেনারেলরাও লড়াই করে না। লড়াই করে সাধারণ লোক। যে সব ভদ্র মহোদয়গণ যুদ্ধং-দেহী বক্তৃতা করছেন বা যুদ্ধংদেহী লেখা লিখছেন তাদের যদি সবাইকে একত্রিতও করা যায় তা'হলেও একটা ফিল্ড কোম্পানী গড়ার মত তাদের সংখ্যা হবে কিনা সন্দেহ।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা জানি, আমরা এখানে যাঁরা একত্রিত হয়েছি তাঁরা এমন একদল লোক নয় যাঁরা একই রকম ভাবনাচিন্তা করেন। এটা থিয়োরিস্ট-দের একটা আড্ডা নয়। না, মোটেই তা নয়। আমি আবার বলছি, প্রকৃত অর্থে আমরাই সমস্ত মহাদেশের লোকের খাঁটি প্রতিনিধি—যে লোকেরা যুদ্ধ লড়তে চায় না, যারা কিছুতেই লড়বে না আমরা তাদেরই প্রতিনিধি।

আমাদের দৃঢ় কণ্ঠে সকলের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করতে হবে :

"যুদ্ধ হবে কি হবে না এ প্রশ্ন লটারী বা জুয়াখেলার প্রশ্ন নয়। এটা এ প্রশ্নও নয় যে, অমুক বা তমুক দেশে কত সংখ্যক মানসিক অসুস্থ লোক দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত আছে। যুদ্ধ হবে কি হবে না নির্ভর

করে কোটি কোটি সাধারণ লোকের উপর—যাদের প্রতিনিধি হয়ে এখানে আমরা এসেছি।”

প্রত্যেক জীবন্ত মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে—মিসিসিপির নিগ্রো থেকে শুরু করে ভারতের অচ্ছ্যুৎ পর্যন্ত, সিসিলির খেতমজুর থেকে শুরু ক'রে মার্সাই বন্দরের খালাসী পর্যন্ত—সবারই ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। সারা দুনিয়া ভোট দিক। ভোট দিক ধুরন্ধরদের নির্দেশমত নয়, ভোট দিক বিবেকসম্পন্নভাবে। প্রত্যেক জীবন্ত মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে এবং আমরা জানি প্রত্যেক জীবন্ত মানুষ ভোট দেবে একটা নতুন যুদ্ধের সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

ভোট দেওয়ার অধিকার আছে মৃতদেরও—স্টালিনগ্রাদের বীরের দল, ইউরোপের গেরিলা বাহিনী, লিডিস এবং ওরাডোর জার্মান বন্দীনিবাসের শহীদবৃন্দ, যে নির্দোষ শিশুরা মরেছে লণ্ডনে, রটারডামে, ওয়ারশতে—তাদেরও ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। আমরা কবরগুলোর কথা স্মরণ করছি। ঐ মৃতের দল নতুন রক্তপিপাসু মানুষগুলোর বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়ছে, হুংকার অতি-মানব এবং তাদের বীভৎস মহা-বোমার বিরুদ্ধে!

যুদ্ধবাদীরা দেখাতে চেষ্টা করে যে, আমাদের আন্দোলন—যে-আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন আদর্শের সমাবেশ হয়েছে—এমন একটা আন্দোলন যার উদ্দেশ্য নাকি সোভিয়েট ইউনিয়নকে রক্ষা করা!

নিজের পক্ষ থেকে এবং সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে আমি এ কথাটা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, শান্তির সমর্থকেরা সোভিয়েটকে রক্ষা করছে না, বরং সোভিয়েট জনগণ অন্যান্য জনগণের সঙ্গে একত্রে মিলে এবং মার্কিন ও বৃটিশ জনগণের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রে মিলেই শান্তিকে রক্ষা করছে।

সোভিয়েট জনগণ শান্তির পতাকা তুলে ধরে এজন্য নয় যে তারা দুর্বল। তারা শান্তিকে রক্ষা করে কারণ তারা নৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী, কারণ তারা ভবিষ্যতকে বিশ্বাস করে, কারণ তারা সৃজনশীল শ্রমে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে তাদের শিশু সন্তানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে। আমাদের কোনো ভয় নেই। আমাদের শক্তি পরীক্ষিত হয়ে গেছে—পরীক্ষিত প্যারেডের ময়দানে হয়নি, অলিম্পিকের খেলার মাঠেও হয়নি, হ'য়েছে স্টালিনগ্রাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।

আজ যে আমরা ফাশিস্ট আর্মির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধের শেষে

বিজয়ী হয়ে বেরিয়েছি তার কারণ আমাদের এমন অস্ত্র ছিল যা সত্যিই দুর্ভেদ্য—এটা আমাদের রাজনৈতিক চেতনার অস্ত্র, আমাদের জীবনস্পৃহার অস্ত্র।

যে শহরে এখন আমরা সভা করছি—যে শহরটা দৈবাৎ যুদ্ধের বর্বরতা এড়াতে পেরেছে—সেখানে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই আমরা সোভিয়েটের লোকেরা শুধু লেনিনগ্রাদের শিশুদেরই রক্ষা করছি না—লেনিনগ্রাদ দেখিয়ে দিয়েছে কিছুতেই তাকে নোয়ানো যায় না—আমরা স্টকহমের শিশুদেরও রক্ষা করছি। কারণ আমাদের কাছে শিশুরাই ভবিষ্যত। তাই তারাই আমাদের বন্ধু। এবং ঐ অতি-মানব এবং মহা-বোমার কাছে শিশুদের মূল্য কি? শিশুরা ওদের আক্রমণের আকস্মিক শিকার, রক্তাক্ত পোকার খেলার অপ্রয়োজনীয় ঘুঁটি।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের চিন্তার প্রাণশক্তি সম্পর্কে আমরা সোভিয়েট লোকেরা বিশ্বাস রাখি, কাজেই বোমা বা মহা-বোমার সাহায্যে আমাদের চিন্তার পৃষ্ঠ-পোষকতা করার ইচ্ছা আমাদের নেই। আমাদের সৃজনশীল শ্রম সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস রাখি, কাজেই জোরজবরদস্তির সাহায্যে আমাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণ করার ইচ্ছা আমাদের নেই।

আমাদের ন্যায়নীতির কথা আমরা অন্য লোককে বোঝাচ্ছি এবং বোঝাব—বোঝাব আমাদের শহরগুলোর মারফত যেগুলো বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে, বোঝাব আমাদের ফসল বৃদ্ধির মারফত, বোঝাব বইপুস্তকের মারফত, বোঝাব আমাদের মানবিক চেতনা বৃদ্ধির মারফত যে মানবিক চেতনাবৃদ্ধি শহরগুলোর বিস্তারকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

যে সব দেশে ভিন্ন চিন্তা এবং ভিন্ন অর্থনীতি চলছে সে সব দেশ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব আর একবার আমি ব্যাখ্যা ক'রে বলতে চাই। সোভিয়েট জীবনযাত্রা আমরা কারো উপর চাপিয়ে দিতে চাই না। এটা রপ্তানী করার জিনিস নয়।

সোভিয়েটে শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা রয়েছে। একটা কারখানা অন্যটাকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের কাজের কার্যকারিতা সম্পর্কে, তাদের জিনিসের উৎকর্ষতা সম্পর্কে। বেশ, আমরা সোভিয়েটের লোকেরা আমাদের মার্কিন অশুভকামীদের চ্যালেঞ্জ করছি শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার জন্য!

যুদ্ধবাদীদের স্কীমটা এ নয় যে, একটা বা অন্য একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার

জয় হোক, এমন কি অতি-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও নয়—তাঁদের স্কীমটা এ নয় যে, একটা বা অন্য একটা চিন্তার জয় হোক, এমন কি অতি-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তারও নয়। যুদ্ধের সমর্থকদের স্কীম হ'ল, মানবিক সভ্যতা ধ্বংস করা।

আমরা জানি সংস্কৃতির জন্য একটা প্রগতিশীল সৃজনশীল প্রেরণা এবং বারে বারে নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে। আমরা সোভিয়েটের লোকেরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টির ধারাকে উচিতভাবে বহন করতে চেষ্টা করছি, যুগে যুগে সমস্ত মানুষ যা সৃষ্টি করেছে আমরা তার যোগ্য বাহক হতে চেষ্টা করছি।

সুতরাং আমাদের পক্ষে নিদারুণ সত্য হল এই যে, স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের কাছে প্রিয়, তা সে যে দেশেরই হোক; সমস্ত শিশু আমাদের প্রিয়, তা সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই বেড়ে উঠুক।

যুদ্ধবাদীরা শান্তির সমর্থক, আমাদের, বিরুদ্ধে তথাকথিত "পশ্চিমী সভ্যতা" নামক একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে। যাঁদের মধ্যে রসবোধ লুপ্ত হয়নি তাঁদের প্রত্যেককে আমি জিজ্ঞাসা করব :

কোন্ মানুষের কাছে ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক বারভোলেত, পাস্তর এবং কুরির সাধনা বেশী প্রিয়—মিঃ একেসনের কাছে অথবা জোলিয়ো-কুরির কাছে ?

লুভার এবং প্রাদোর মিউজিয়ামের ভাগ্য সম্বন্ধে কে বেশী আগ্রহান্বিত—জেনারেল ফ্রাঙ্কো অথবা পাবলো পিকাসো ?

কে কত বেশী শেক্সপিয়ারের নাটক দেখতে যায় এবং কে কত ভালোভাবে শেক্সপিয়ারকে বোঝে—সোভিয়েট শ্রমিকেরা অথবা জাঁহাবাজ মিসিসিপি রাষ্ট্রের দাসপ্রভুবৃন্দ ?

আর একবার আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই : আমরা, শান্তির সমর্থকেরা, মতামত নির্বিশেষে মানবিক সংস্কৃতির প্রকৃত রক্ষক। আমরা ইউরোপের বহুমুখী মহান মধুচক্রটিকে রক্ষা করছি—এর শহরগুলো, মিউজিয়ামগুলো এবং স্কুলগুলো আমাদের কত না প্রিয়! আমরা রক্ষা করছি নব জাগ্রত এশিয়ার সংস্কৃতিকে—যে এশিয়া সভ্যতার জন্ম নিকেতন।

সম্প্রতি একজন ফরাসী একাডেমিসিয়ান যুদ্ধবাদীদের প্রতি পরিকার সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে লিখেছেন যে, চীন এখন ইউরোপীয় সংস্কৃতির বাইরে চলে গেল। না, মোটেই না। চীন এখন নির্বোধ জ্ঞানহীন লোভী ব্য-

লিপ্সু ব্যবসায়ীদের আওতার বাইরে চলে গেল। কিন্তু চীন এখন তার দরজা খুলে দিয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে এবং নিজের সৃজনশীল অবদান দ্বারা ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্যবান করতে চীন এখন প্রস্তুত।

পরিধি এবং সম্ভাবনার দিক থেকে আমাদের আন্দোলন বেড়ে চলেছে। কিন্তু আমি সাহসের সঙ্গে এ কথা বলতে চাই যে, যে-গতিতে সারা দুনিয়ায় সমস্ত সৎলোকের প্রাণে শঙ্কাবোধ এবং ন্যায্য ঘৃণার ভাব জেগে উঠছে, সেই তুলনায় আমাদের আন্দোলন বিস্তৃত হচ্ছে না, বেড়ে উঠছে না।

আমাদের চেষ্টাকে বাড়াতে হবে দশগুণ এবং সমস্ত জাতিকে সত্যিকারভাবে মেলাতে হবে।

আমরা সোভিয়েট প্রতিনিধিরা চাই : আমাদের বাহিনী বেড়ে উঠুক। যে মতামতের লোকই হোক, মতামত নির্বিশেষে সমস্ত শান্তি সমর্থকদের দিকে আমরা আমাদের হাত বড়িয়ে দিচ্ছি।

আমরা দেখে আনন্দিত হচ্ছি যে, আমাদের সঙ্গে আছেন ফাদার বাউলিয়ের, আছেন ডিন অব ক্যান্টারবেরি, এবং অনেক ধর্মমতের ধর্মযাজকগণ। আমরা দেখে আনন্দিত হচ্ছি যে, আমাদের সঙ্গে আছেন উদারপন্থীগণ, স্বাধীন প্রতিযোগিতার প্রচারকগণ, ভাববাদী দার্শনিকের দল এবং আছেন এমন সব লেখক যাঁদের সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে মতামত আমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তর্কাতর্কি আমরা অন্য জায়গায় করব। বিতর্কের ফলে সত্য উদ্ঘাটিত হয়। কিন্তু এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি এমন একটি চেতনা থেকে যার মধ্যে বিরোধের কোনো অবকাশ নেই—শান্তির জন্য সংগ্রামে!

যুদ্ধবাদীরা সোভিয়েটের লোকদের অসহিষ্ণুতা সম্পর্কে কথা বলতে ভালবাসে। তারা অভিযোগ করতে ভালবাসে যে, আমরা নিজেদের পৃথিবীর বাইরে স্থাপন করেছি। যথেষ্ট হয়েছে! মিঃ রোগে ক্রেমলিন দর্শন করেছেন এবং সেখানে যখন ছিলেন তখন তিনি নিজের মতামতের স্বপক্ষে কথা বলেছেন—যে সব মতামত মোটেই আমাদের মত নয়। কিন্তু এজন্য আমরা তাঁকে অনুসন্ধানকারী ফেডারেল ব্যুরোর সামনে তলব করি নি। আমরা বন্ধুভাবে এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে শেষ করেছি।

কোথায় সেই জিনিসটা – সেই কুখ্যাত "লৌহ যবনিকা?" শান্তির সমর্থক—মাত্র এই কারণে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোকে কে তার দেশের মধ্যে ঢুকতে দিতে সাহস করে নি? ডিন অব ক্যান্টারবেরির মুখের সামনে কে

দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ? ওটা কি কোনো মার্কসবাদীদের, না কোনো সন্দেহজনক খৃষ্টানদের দেশ ?

আমরা শান্তির সমর্থকদের প্রতিনিধিত্ব করি এবং যে কেউ শান্তির সমর্থক সেই যুদ্ধবাদীদের কাছে একজন 'লালমার্কা লোক' একজন 'কমিউনিষ্ট', এমন একজন লোক যাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে অথবা জেলখানার মধ্যে তালাচাবি বন্ধ করে রাখতে হবে।

কূটনীতিবিদদের আলাপ আলোচনা অনেক হয়েছে। বোমা নিয়ে পাগলদের খেলা গড়িয়ে গড়িয়ে চলছেই ক্ষমাহীনভাবে। পৃথিবীর সমস্ত সৎলোককে আমাদের ডেকে বলতে হবে, আপনারা এটম অস্ত্রকে অবিলম্বে পুরোপুরিমাত্রায় বিনাশর্তে নিষিদ্ধ করবার জন্য ধ্বনি তুলুন, দাবি করুন।

কচি কিশোরদের নিকটে পর্যন্ত ঐটা পরিষ্কার যে, এ্যাটম বোমা হল অন্যের উপর হামলা করার একটা অস্ত্র। যে কেউ আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করুক, যে কেউ সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে বাধা দিচ্ছে সে তার ফলে নিজের মুখোশই খুলে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে এবং তারফলে সে বলছে : "আমি আগামীকালের একজন পররাজ্যগ্রাসী!"

নুরেমবার্গ বিচারের সময় একজন আসামী বলেছিল : "আমরা দেখতে পাইনি ব্যাপারটা ঠিক এভাবে শেষ হবে ...।" যে সব লোক ইওরোপকে রক্তবন্যায় ডুবিয়ে ছিল তারা দেখতে পায় নি একদিন তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। যারা আজ এ্যাটম বোমা দিয়ে সংস্কৃতি, জীবন এবং ভবিষ্যতকে ধ্বংস করতে চাইছে আমাদের পক্ষ থেকে সম্ভবত তাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, তাদেরও অবশেষে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে—বিশ্ব-শাসকবৃন্দের সিংহাসনে তারা বসতে পারবে না।

মনে হয়, সকলে যাতে শুনতে পায় সেজন্য এরকম ঘোষণা করা উচিত যেরাষ্ট্র, শাসক এবং মিলিটারীগোষ্ঠী পররাজ্যগ্রাসের জন্য এ্যাটমবোমা ব্যবহারের দুঃসাহস করবে তাদেরকে পাপিষ্ঠ বলে চিহ্নিত করা হবে, তাদেরকে মানবতার হত্যাকারী হিসাবে জীবনের অন্তিমদশা নিদারুণ নিষ্করুণ লজ্জাজনকভাবে শেষ করতে হবে।

আমি ধরে নিচ্ছি, কেবলমাত্র পাপিষ্ঠরাই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে পারে। যারা এ্যাটমবোমা ব্যবহার করে তারাই যুদ্ধপাপী, আমাদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি কোনো দেশের শাসকবর্গ মতপ্রকাশ করে তাহলে তারা

নিজেদের মুখোশই উন্মোচন করবে এবং এ-কথা প্রমাণ করবে যে, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার পাত্র তারাই।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা যখন আমাদের দেশে ফিরে যাব তখন নতুন উদ্যমে আমরা কাজ শুরু করব। যে সমস্ত মূল্যবান সিদ্ধান্ত আমরা এখানে গ্রহণ করব তাতে আমাদের শান্তির সংগ্রামকে আরও বাস্তব ক'রে তুলবে এবং লক্ষ লক্ষ নতুন লোককে আমাদের বাহিনীতে টেনে নিয়ে আসবে।

আমরা কাউকে ভয় দেখাচ্ছি না। কিন্তু যারা প্রত্যেককে ভয় দেখাচ্ছে তারা জেনে রাখুক তাদের হিসেবনিকেশের ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা আমাদের পবিত্র কর্তব্য করে যাচ্ছি। বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি হিসাবে আমরা এই প্রতিজ্ঞা করছি : নতুন রক্তপিপাসু লোকদের হাত থেকে আমরা মারাত্মক অস্ত্র কেড়ে নেব। আমরা রক্ষা করব শান্তি, চিন্তা এবং জীবনকে।

ইলিয়া ইয়েরেনবুর্গ

প্রেমপল্লী

শিকারী বিড়ালের মত শাদা ধবধবে গোঁফ জোড়া—চোখেও তেমনি এক সতর্ক চাউনি—কান ছুটো সর্বদাই থাকে খাড়া—এই তিনটি বিশেষত্ব ছিল ব দত্তের।

আর অভিনবত্ব ছিল তাঁর তামাক খাওয়ায়। গুড়ুক গুড়ুক করে তি সারাদিন ধরে তামাক টানতেনই, কিন্তু অমন স্নগন্ধি অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া গুলো মোটেই গলধঃকরণ করতেন না। এর হেতুটা সবাই বুঝত না। বুঝ একমাত্র তারাই, যাদের ওর সঙ্গে লেন-দেন মেলামেশা ছিল। নেশাকে তি সঙ্গী করেছিলেন বটে, কিন্তু নেশা তাঁকে বশীভূত করতে পারে নি। তবে দোষ থেকেও একেবারে পরিত্রাণ পাননি বটু দত্ত, ধোঁয়ার প্রভাবে খানিক শাদা গোঁফ তাম্রবর্ণ ধারণ করেছিল।

বড়লোক হওয়াটা যদি দুর্নাম হয়, বেশ বড়লোকই ছিলেন বটু দত্ত। আস কারবার ছিল তাঁর জমিজমা নিলাম, বিক্রি, স্নবিধা মত খরিদ করা—অসুবি হলেই হাত বদলাই করা। পত্তন দিয়ে, ভাড়া বৃদ্ধি করেও তাঁর আয় বিস্তর। স্বনামী বেনামী স্থাবর সম্পত্তি ছিল দু কিসিম।

এবার অদ্ভুত প্ল্যান মাথায় এল একটা কলোনী গড়ে তোলবার। সা বাঙলা দেশ জুড়েই রায়ট হচ্ছে, কিন্তু পূর্ব বাঙলার খবর পড়ে তিনি একেবা মর্মাহত! অমানুষিক কাণ্ড!

চোখে জল এল বটু দত্তের। উনিশশ' পঞ্চাশের ইতিহাসের গ্লানি যতটা দূর করার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। হিন্দুর এ হাহাকার তার বড় বেজেছে। হাজার হলেও স্বজাতি তো!

'বাবা খেতে যাবে না? অফিসের যে সময় হয়ে এল।' মেয়ে অনি কয়েকটা সোফার পাস কাটিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। তার হাতের পাথরের আংটিটি জানালার রোদের একফালি রেশে জল জল করছে। বল লুটিয়ে পড়েছে নিতম্ব পর্যন্ত। এই মাত্র স্নান সেরে বোধ হয় এল অনি বয়স বেশি নয়, হয়ত হবে পনর কি ষোল!

এমন কিছু সুন্দরী নয় অনিতা। তবু হঠাৎ দেখলে চোখ ফেরান যা

পিতার চোখেই, যে চোখ সর্বদা দেখছে মেয়েকে, যদি সুন্দরী বলে ভ্রম হয়, তবে বাইরের যুবকদের কাছে যে রহস্যময়ী হয়ে রইবে তাতে আর আশ্চর্যের কি? নারী সুলভ সমস্ত পেলবতাই তন্বী অনিতার দেহে ঝলমল করছে। তবু সে নিখুঁত-সুন্দরী নয়—অথচ সমস্ত আকর্ষণের যেন কেন্দ্র। দয়া মায়া মমতা স্নেহ পুরুষের যা কিছু দুর্বলতা একে ঘিরেই আদিম কাল থেকে বিরাজ করছে—ঘুরছে যেন চাকার মত।

বটু দত্ত দেখলেন, তার মেয়েই যেন প্রতীক একটা বিরাট নারী সমাজের বিশেষ করে বাঙালী স্ত্রী সমাজের—ভঙ্গুর, দুর্বল কিন্তু কত প্রয়োজনীয়!

এদের মত হাজার হাজার অসহায়া আজ পূর্ব বাঙলায়...আর ভাবতে পারেন না বটু দত্ত। উঃ, কি মর্মন্তুদ!

আগুন নেই, তামাক অনেক আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—তিনি ফার্সির নলে গোটা কয়েক কড়া টান দিয়ে হাঁকেন 'বিন্দাবন, বিন্দাবন!'

বৃন্দাবন এগিয়ে আসে একখানা চিরকুট নিয়ে। কে যেন দর্শনপ্রার্থী। এসেছে কিছু ভিক্ষা চাইতে—মাতৃশ্রাদ্ধ না পরীক্ষার ফি বকেয়ার আর্জি যেন।

'হাঁকিয়ে দে, তামাক আন। ডাক অনিতা তোমার মাকে।'

তামাক এল, সঙ্গে সঙ্গেই এলেন গৃহিনী। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে এসেই সুমুখে দাঁড়ালেন।

সুরমার দেহেও সেই একই ছন্দ—শুধু একটু প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েছে—কিন্তু তাতে যেন মাদকতা আরও গাঢ় হয়েছে চাক ভাঙা মধুর মত। মনে সেই বাঙালী বধূ সুলভ আশঙ্কা ও জিজ্ঞাসা। স্বামী পুত্রের শুভাশুভই যেন এঁদের সব।

'হঠাৎ আজ আফিস কামাই দিলে যে? শরীরটা ভাল আছে তো?'

'আর শরীর দিয়ে কি করব সুরমা—গেল, সব গেল।' বটুদত্ত সশব্দে ফেলে দিলেন একটা খবরের কাগজ সুমুখের টেবিলের উপর। 'আমাদের মত এমনি কত হাজারও পরিবার যে উদ্বাস্তু হয়েছে—সুখী বড় ছোট কত যে পরিবার! আর লাঞ্ছিত হয়েছে যে কতশত নারী।'

'চুপ কর তুমি।' চোখ টিপ দিলেন সুরমা।

'আমার না হয় মুখ বন্ধ করলে, কিন্তু শহরময় কি যে বিষ ছড়াচ্ছে কাগজওলা।'

'তাদের কাজ তারা যা ভাল বোঝে করুক, আমাদের কাজ নয় তাই নিয়ে হৈ চৈ করা। ওতে যে এখানের নিরীহগুলো মারা যাবে।'

'ভাল কথা বলেছ সুরমা—বুদ্ধিমতীর মতই বলেছ। এখন শোন তোমা মায়ে-ঝিয়ে। আমরা দু'পুরুষ আগে ছিলাম পূর্ব বাঙলার বাসিন্দা। ছো বেলায় আমিও দেশে গেছি কবার। যদি তোমরা সে দেশ দেখতে। নদী জলে ধানে মাছে পরিপূর্ণ সবার ঘুম।'

'তবে এমন দেশ বাবা ছেড়ে এলেন কেন তোমার পূর্বপুরুষ?' অনিতা এগি এল।

বটু দত্ত বিরক্ত হলেন। তিনি একটু মৌন থেকে অন্য প্রসঙ্গে গেলে

'আমি এই বাস্তুহারা সর্বহারা স্বজাতিদের একটা আশ্রয় গড়ে দিতে চা লক্ষ লক্ষের কিছু করা আমার সাধ্যাতীত তবে অন্তত এক সহস্রের একটা বা হয়ত করতে পারব।'

'এ তো চমৎকার কথা!' সুরমা মন্তব্য করলেন।

অনিতা হেসে উঠল।

বটু দত্ত আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অনিতা চলে গেল।

সুরমা বললেন, 'তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খেয়েছ।'

প্রকাণ্ড একটা অফিস। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাট জুড়ে কেরানি ও সিয়ার, ড্রাফট্‌সম্যান পিওনের কর্মব্যস্ততা। বহু প্ল্যান পিনে আঁটা দেয়ালে দেয়ালে। একখানা মূল্যবান আধুনিক ভারী গাড়ী থেকে বটু নামলেন। নিকটের ভীড় সরে গেল—অনেকগুলি সেলাম তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিল। তিনি এখন একেবারে সাহেব। স্মিত মুখে একখানা কপালে ঠেকিয়ে রেখে ওপরে উঠলেন।

এ বটু দত্তের নিজস্ব আফিস—একেবারে জমিদারীর সামিল কিম্বা চাইতেও বেশী।...বটু দত্তের ব্যবহার অতি চমৎকার। নইলে এতগুলো মাইনে যা পায় কি না পায়, খায় কি না খায়, একেবারে কলের পুতুলে সব চুপ চাপ, নিজের নিজের কাজে মগ্ন।

বটুদত্ত সময় সময় আনন্দে ভাবেন—এ তাঁরই অশেষ শ্রম ও পারিতোষিক। এখানে অসুখী নেই একটি প্রাণীও।

বায়ু নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে বটু দত্ত ম্যানেজার মিস্টার কাপুরকে সংবাদ দি ওভারসিয়ারও তিন চার জন হাজির হল। কথাটা সকলে মন দিয়ে ম্যানেজার যেন মর্মে গেঁথে নিলেন। এত বড় উদারতার কথা সহজেই গড়ল আফিসময়। ম্যানেজারের যেমন মাইনে বেশী সেই তুলনায় প্র

অত্যুগ্র। তিনিই ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন সবাইকে। মনিবের সামনেই তিনি জুনিয়ার গ্রেডের কেরানি রমেনকে জানিয়ে দিলেন যে, কালই যেন এক একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সমস্ত নাম-করা কাগজে।

'We are in Heven…কি বল রমেন?'

রমেন যেন কাষ্ঠ হাসি হেসে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে—লক্ষ্য করলেন বটুদত্ত।

'স্থানটা কোথায় নির্বাচন করা যায় মিস্টার কাপুর?'

দু'কাঠা করে দিলেও হাজার লোককে দু'হাজার কাঠা জমি দিতে হবে—তা প্রায় একশ বিঘার একটা প্লট, এত বড় একটা প্লট সেই সাউথে বড় রাস্তাটার মোড়ে ছাড়া নেই।

'সেখানে যে জমির দাম বিস্তর। কত লক্ষ টাকা হিসেব করে দেখেছেন কি একবার?'

'yes sir—সে জন্য ভাবতে হবে না আপনাকে।'

'সে জায়গাটা কি এতদিন খালি পড়ে রয়েছে?'

'না, না—সেখানে কতগুলো বুক বাইণ্ডার, কুলী, দর্জি monthly rent system-এ রয়েছে। ভাড়া দিচ্ছে না অনেকদিন, দখলও ছাড়ছে না কেউ। মামলা চলছে চার পাঁচ নম্বর। বলছে দাঙ্গার ভয়তে আমাদের আয় রোজগার একেবারে বন্ধ?'

'অমন সুন্দর প.জিসনের জায়গাটায় হয়েছে কুলী মজুরের বস্তি—তাতে আবার আয় হচ্ছে না মোটে! এতদিন এসব আমাকে জানান নি কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম, আমি…' আমতা আমতা করতে থাকেন বিলেত ফেরত ম্যানেজার।

'ওরা কি জাত?'

'Muslim Labourer…তা ছাড়া আর কি?'

'তা হলে তো চিন্তার কথা। ওরা দিন কাটাচ্ছে হাঁড়িতে জিয়ান কৈ মাছের মত। আহাহা ছেলে মেয়ে নিয়ে কি ভাবে যে আছে! চারদিকে সব মারমুখি সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি তো জানি ওপাড়ার মানুষগুলোর মনোভাব।' রীতিমত চিন্তাকুল দেখায় বটু দত্তকে।

সেদিনের মত ঐখানেই স্থগিত থাকে প্ল্যানটা।

ম্যানেজারের মুখের কথায় বিশ্বাস করে বসে থাকার ব্যক্তি নন বটু দত্ত।

তিনি পরদিনই মোটর নিয়ে বের হলেন, ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করলেন চারদিক। দেখলেন যে ভীত সন্ত্রস্ত মুসলমানরা দু'চারজন করে তাদেরই সমশ্রেণীর হিন্দু বান্ধবকে এনে ভাড়াটে হিসেবে বসিয়েছে এক বাড়ীতেই। ওখানে একটা নতুন দাঙ্গা-বিরোধী কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সমবেত হিন্দু মুসলমানের।

'বড় খুশি হলাম তোমাদের দেখে। তোমরা ফাঁসিয়ে দিয়েছ যত বজ্জাতের চক্রান্ত।'

'জী মহারাজ!' বলে এগিয়ে এল হিন্দু কটি কুলী। পিছনে পিছনে দেখা গেল চারপাঁচ জন মাতব্বর গোছের মুসলমান। 'সেলাম হুজুর—দেখবেন আমাদের সব জান প্রাণ।'

একজন হিন্দু কুলী, বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান, বলল যে তারা বেঁচে থাকতে কিছুতেই কেউ গায় হাত দিতে পারবে না ঐ নিরীহ ভাইদের।

কতগুলো পর্দানশিন স্ত্রীলোক মনিবের ভরসা কুড়িয়ে নেওয়ার আশায় আধ-বোজা রাখল জানালা কপাট।

বটু দত্ত দেখলেন সবই, বুঝলেন একেবারে তলিয়ে—যা বিলেত ফেরত ম্যানেজারের বুঝতে লাগবে এখনও দেড় বছর, তিনি সাহসী কুলীটিকে বললেন, 'সাবাস জোয়ান।' মুসলমান প্রজাদের ভরসা দিলেন, 'ডর মত—ঘাবড়ানে কো কেয়া বাত্ হ্যায়।'

রুদ্ধশ্বাস ছেড়ে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করল পর্দানশীন মেয়েরা। এমন না হলে মনিব। ওরা ভাড়া দিতে পারে না কমাস তবু সে কথা তো তুললেন না একবারও। খোদা এমন মনিবের হাজার বছর পরমায়ু দাও।

অফিসে গিয়ে বটু দত্ত ম্যানেজারকে ডেকে কিছু কড়া কড়া কথা শোনালেন বললেন, 'আপনি যা জানেন এবং ভাবেন ব্যাপারটা তার চাইতেও জটিল।'

উচ্চপদে বিলেত ফেরত কিম্বা আই-সি-এস'রা অধিষ্ঠিত থাকে কেন! সহজে তারা সুগম করতে পারেন জটিল পথ।

সেইদিনই এয়ারপ্লেনের টিকিট কেটে বটু দত্ত বোম্বে না কোথায় যেন চলে যান এক জরুরী মিটিং-এ। যাওয়ার সময় বলে যান, 'মিষ্টার কাপুর আপনি নিশ্চয় হিন্দু, শিবি রাজার উপাখ্যান তো পড়েছেন—কেউ যেন আমাদের দোষারোপ করতে না পারে।'

সঙ্গে সুরমা ও অনিতা যায়।

পিতার কথা শুনে সে একা একা হাসে একটু।

সপ্তাহ খানেক বাদে ফিরে এলেন বটুদত্ত।

ফিরে এসেই তিনি মোটরে উঠলেন। মোটর লাগল গিয়ে একেবারে সেই বস্তিটার সামনে। উনিশে, বিশে, একুশে এই শহরতলী অঞ্চলে দাঙ্গা হয়ে গেছে গুরুতর। এখনও টিমিয়ে টিমিয়ে আগুন জ্বলছে ভাঙা-চোরা চৌকাঠে, মটকার ধোঁজা শক্ত পাঁজরে। স্তূপিকৃত হয়ে রয়েছে অর্ধদগ্ধ লেপ তোষক। পুড়েছে রামায়ণের সঙ্গে দু একখানা কোরান শরীফ। মরা কাকের মত পড়ে আছে দুটো পৌরাণিক সংস্কৃতির স্মৃতি চিহ্ন। মাঝে মাঝে একটা আধটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে—তা যেন শবের গন্ধে ভরা।

বটুদত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ কি বেঁচে নেই?'

পাশের একটি পথচারী জবাব দিলে যে রাত্রে কদিনই সে হাহাকার শুনে বেরিয়েছে, কিন্তু এগুতে সাহস পায়নি মিলিটারির বন্দুকের ভয়ে। তবে প্রায় সব মুসলমানই নাকি সরে পড়েছে পার্ক সার্কাসের দিকে, কিছু হিন্দুও নাকি গেছে অন্যত্র। শুধু তিনচার জন হিন্দু কুলি জান কবুল করে লড়েছে মুসলমান মেয়েদের ইজ্জৎ রক্ষা করতে। বাইরের গুণ্ডা এসেছিল অনেক, তারা পুলিসকেও হিমসিম খাইয়ে ছেড়েছে। আশ্রিত কুলি ভাড়াটেরা নাকি পিছু হটে নি। শিবিরাজা আশ্রিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল, আর এরা আশ্রয় পেয়ে দিল সমধর্মীর জন্য প্রাণ! জীবিত অবস্থায় যে ভরসা দিয়েছিল, মরে গিয়েও সে সত্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে!

এরাই আসল শহীদ বটে!

বটু দত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মোটরে উঠলেন।

ড্রাইভার প্রশ্ন করল, 'কোন দিকে চালাবে?'

'পার্ক সার্কাস।'

একটা ষণ্ডা গোছের লোক এসে সেলাম জানাল এই সময়। 'হুজুর ত্রিশ বছর মামলা লড়ে যা হয়নি...'

বটুদত্ত তার দিকে ফিরেও চাইলেন না। হুমুখের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত তাঁর মুখমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন।

পার্ক সার্কাসে এসে গাড়ী থামল।

বটুদত্ত নিজেই দরজা খুলে নামলেন।

ড্রাইভার বলল, 'হজৌর'...অর্থাৎ কিনা এভাবে একা একা ওঁর যাওয়া উচিত নয়।

'চুপ কর।' জীবন বিপন্ন করেও এগিয়ে চললেন বটুদত্ত। কয়েক জন নেতৃস্থানীয় মুসলমানকে একত্র করলেন এক পার্কে। দু'চার জন পুরান ভাড়াটেও এল। পোড়া কাঠের মত দেখতে হয়েছে তাদের চেহারা।

বটুদত্ত—লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বটুদত্ত, এই পোড়া কাঠদের হাত ধরে অনুনয় বিনয় করলেন, বললেন, 'তোমরা ছেলের সামিল, তোমাদের কাছে আমি কিছু কসুর করিনি, যদি অন্য কেউ না বুঝে কিছু করে থাকে, তা আজ ভুলে যাও, ফিরে চলো বস্তিতে।

'কি করে গিয়ে ওরা আবার বাস করবে?'

'আমি গাড়ী ভাড়া দেব, যাবতীয় খেসারত দেব, তুলে দেব পূর্বের চাইতে ভাল ঘর।'

বটুদত্তের আন্তরিকতা দেখে সকলে ধন্যবাদ জানাল।

পরদিন বটুদত্তের এ মর্মস্পর্শী আবেদন নাকি বড় বড় হরফে ছাপা হল খবরের কাগজে। কোন সাংবাদিকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ তাঁর কোন আলাপ হয়নি কিন্তু তবু তাঁর একটা ফটোও নাকি বের হয়েছিল ঐ আবেদনের পাশে বেশ সামঞ্জস্য রেখে।

সপ্তাহ গেল, একপক্ষ অতীত হল—মাসও প্রায় কাবার হতে চলল, কৈ কাউকে তো ফিরতে দেখা গেল না।

'সকলে বিশ্বাস হারিয়েছে সুরমা।'

'এত করে বললে তবু কেউ বুঝল না?'

'না সুরমা। ভাঙা কাঁচ কখনও জোড়া লাগে না।'

'লাগে বাবা, সে উদ্যম ও বৈজ্ঞানিক উত্তাপ তোমাকে দিয়ে তো সম্ভব নয়।'

'চুপ কর অনিতা—কেবল বড় বড় কথা! উনি আর কি করবেন?'

'আমি না হয় চুপ করেই রইলাম, কিন্তু এর ফল জেনো ভাল হবে না।'

'কেন, কেন?' হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বটু দত্ত।

মেয়ে অনিতা হেসে চলে গেল—আর জবাব দিল না।

অনিতার মন্তব্যের পর কয়েকদিন কাজ বন্ধ রইল।

তারপর পূর্ণ উদ্যমে একদিন পঁচিশখানা লরী বোঝাই করে বস্তির আবর্জনা, ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করা হল।

পূর্ব বাঙলা থেকে নিত্য সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু আসছে, আসছে যেন অমাবস্যা জো-য়ের জোয়ারের মত। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়েই আসছে।

বটুদত্তের নির্দেশ অনুসারে ম্যানেজার স্থানে স্থানে লোক পাঠিয়েছেন। মাত্র দশ টাকা জমা দিলেই এক এক কাঠা জমি পত্তন দেওয়া হবে, তবে কুড়ি টাকা দিলে তুলে দেওয়া হবে ঘর পর্যন্ত। টাকাটা দিতে হবে অগ্রিম, বিনা রসিদ পত্তরে?

কে আর দশ দেয়—জমা পড়তে লাগল কেবল কুড়ির অঙ্ক। নোট, চেক, নগদ কাঁচা টাকা, যে যা পারছে জমা দিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বা নিয়ে এল সোনার অলংকার পর্যন্ত। পাকিস্তান থেকে জীবন বিপন্ন করেও যা অতি সংগোপনে এখানে নিয়ে এসেছিল, তাই এখন কায়েমী একটা কাজে লাগিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

অল্পদিনে স্বল্প ব্যয়ে টাকা জমল বিস্তর।

ম্যানেজার এখন দু হাত তুলে নিষেধ করেন, 'আর নয়, আর নয়—আমরা পারব না আর জায়গা দিতে।'

বাইরের অপেক্ষমান জনতা ক্ষেপে ওঠে।

বটু দত্ত স্মিতমুখে গাড়ী হাঁকিয়ে বাড়ী চলে যান।

দুই একজন হোমরা চোমরা অফিসার, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীও কয়েকজন এ সুযোগ গ্রহণ করেন বেনামীতে। যোগ দেন কিছু কিছু উকিল ব্যারিষ্টার। তাঁদের সংগে সংগে আসে এদেশে অনেক দিনের স্থায়ী বহু পূর্ববাঙলার বাসিন্দা—যাদের দু'চারখান বাড়ী ঘরও আছে বিখ্যাত বিখ্যাত পল্লীতে। এরা সবাই আসেন বেনামে আইনের অন্ধি সন্ধি বাঁচিয়ে।

নাম হয়েছে অনেক সহস্র। হয়ত এত বাস্তুহারা সেই অদ্ভুত নিকটে।

একটা সমস্যা দেখা দেয়।

কাকে রেখে কাকে ছাঁটাই করা যায়!

লটারী করে কমিটি গঠন করা হয় ন্যায় সংগত ভাবে।

কিন্তু কি যে কাগজের মাহাত্ম্য নাম ওঠে বাছাবাছা···রুই, কাতলা, কালাবাউস···

চেংরা পুঁটিরা দেখেও কিছু বোঝে না, ধনী ম্যাজিসিয়ানের এ হাত সাফাই কেমন মতে ধরতে পারে না। যদিও বা পারে কিছুটা, কিন্তু সে সময়, পেটে অন্ন, অর্থের সামর্থ কোথায়?

তারা বিদায় হয় মুখ কালি করে।

বটু দত্ত বলেন, সময় মত টাকা ফেরৎ পাবেন আপনারা।

তারপর কে আর টাকা ফেরত চায়—ওরা দলে দলে ভেঙে চুরে এদিক-ওদিক তছনছ হয়ে যায়।

কলোনী গড়ার জন্ম কেউ আর বটু দত্তের সাহায্য চায় না। বটু দত্ত ... করেছেন তাই যথেষ্ট, এখন যে যার ইচ্ছামত ঘরবাড়ী ইমারত তুলে নেবে। কেউ দোতালা, কেউ বা তেতালা।

কিন্তু প্রথম ভিত্তি প্রস্তর গাঁথার সময় তো একটা সভা ডাকতে হয়, জানাতে হয় দত্ত সাহেবকে কৃতজ্ঞতা! এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এ কলোনীর নাম হওয়া উচিত।

সময় মত সভা আহুত হল—এলেন মিষ্টার দত্ত, সংগে এলেন কাপুর ম্যানেজার ... সাংবাদিক ও কয়েকজন নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন সভায়। মালা এল ... মূল্যবান।

সকলে ভূয়সী প্রশংসা করল নিষ্ঠার দত্তের উদারতায়। এমন লোক কম দেখা যায় আজকাল। ঘন ঘন শোনা গেল করতালি।

এমন সময় বস্তির এক পাশের রাস্তা বেয়ে মিঃ দত্তের পিছনে এসে দাঁড়াল এক ভিখারী। ভিখারী নয় যেন একটা পোড়া কাঠ।

বটু দত্ত চোখ ফিরিয়ে শিউরে উঠলেন!

সবাই মিলে পোড়া কাঠটাকে তাড়িয়ে দিল।

আবার ঘন ঘন করতালি ধ্বনি হল। সাংবাদিকরা উপুড় হয়ে পড়লেন ... পেন্সিল নিয়ে—সবাই মিলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম হবে কি এই কলোনীর?'

'প্রেম পল্লী—' অর্থটা বুঝিয়ে দিলেন মিঃ দত্ত, 'এই অনেকটা যেমন ... কলোনী।'

আবার করতালি।

সভা ভাঙল।...

ফুলের মালা নিয়ে অনিতাকে উপেক্ষা করেই সুরমার সুমুখে হাজির ... বটু দত্ত।

সুরমা ফ্যানটা খুলে দিলেন।

* * *

সপ্তাহ মধ্যে শোনা গেল যে বটু দত্তের টুকরা টুকরা প্রায় তিন চারশ ... জমি জবর দখল করে বসেছে সেই বঞ্চিত ছিন্ন ভিন্ন উদ্বাস্তুরা।

—অমরেন্দ্র ...

রেখা

গল্প

ট্রাক্ থেকে নেমে বুড়ো লক্ষ্মন এদিক-ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

তারই সমবয়সী হরেন্দ্র মুখুটী এগিয়ে এসে তার কানের কাছে ফিস্‌ফিস করে বললে, এ যে বাঘাই জঙ্গল!

—ভয় কি? এতগুলা লোক আছি আমরা।

ওদিক থেকে খাকি সার্টপরা একজন হাঁক দিলে, তোমরা আবার ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—চট্‌পট দেখেশুনে নাও। আবায় আবার ফিরতে হবে। হাত ঘড়িটা দেখে নিল সে।

লক্ষ্মণ নিজের অজ্ঞাতেই যেন প্রশ্ন করে বসল, অথনি যাইবেন?

—নাঃ, এখনই যাব কেন? তোমাদের সঙ্গে এই বাদাড়ে সংসার পেতে বসব। হঠাৎ লোকটা চুপ করে গেল; কথাটা বলা ঠিক হয়নি। একটু হেসে আবার বললে, মাল-পত্তরগুলো ভেতরে নিয়ে যান। সময় নষ্ট করছেন কেন?—এই খোকা, শোনো, এদিকে শোনো। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? মালগুলো ভেতরে নিয়ে যাওনা।

ততক্ষণে লক্ষ্মণ মুখুটী এবং আর সবাই যে যার পোটলা নিয়ে হাঁটা শুরু করেছে।

—আচ্ছা, আমি চলি। ওই দিকে একটা পুকুর আছে। একটু এগিয়ে ... হাতে—। সশব্দে ট্রাকটা চলে গেল।

এক হাঁটু জঙ্গলে ভরা খানিকটা জমি। তার তিন দিক ঘিরে লম্বা বারান্দা-ওয়ালা বড় বড় ঘর। ওপরে এ্যসবেস্টস্, মেঝে পাকা, দেয়ালগুলো তৈরী হয়েছে মাটি, খড় এবং আরও কোন্ কোন্ জিনিস দিয়ে তা কেউই বুঝে উঠতে পারল না। ছেলেমানুষী দৃষ্টি নিয়ে সবাই ঘুরে ফিরে দেখে নিচ্ছিল,—ঘর, দোর, উঠান—মোটামুটি পরিবেশটা।

সহসা লক্ষ্মণের খেয়াল হল পুঁটলিটা তার পিঠের ওপরেই রয়েছে তখনও। মনে মনে হেসে ফেললে, ধ্যাৎ, দেখনের কি আছে এর মধ্যে!

ঘরগুলো খুব লম্বা। দড়ি এবং কাপড়ের সাহায্যে সবাই প্রায় নিজের নিজের সাংসারিক আবেষ্টনী সৃষ্টি করে নিয়েছে। —

মুখুটী বারান্দায় এসে দেখল, ছুটি ছেলে এর মধ্যে চোর চোর খেলা শুরু করে দিয়েছে।

—এই, এই। মাহিন্দরের ডিমটা না? হারামজাদা ওখানে কি? আরে সাপে খাইলে রক্ষা করবো কেডা? তবু শোনে নি? মুখুটী ব্যস্ত হয়ে পড়ল, মাহিন্দর, ও মাহিন্দর!

এবারে তারা চুপ করে দাঁড়িয়েছে। নিচের দিকে হু'একবার ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে ত্রস্তপদে ও পাশের বারান্দায় উঠে গেল।

লক্ষ্মণ এসে জিজ্ঞাসা করল, কি, ব্যাপারডা কি?

মুখুটী একটু হেসে জবাব দিল, নাঃ, বনে বাদাড়ে হুড়াহুড়ি করনটা ঠি না, বিশেষ পোলাপান।

লক্ষ্মণ ভিতর দিকে পা বাড়াল।

পেরেকের খোঁজে যখন সে পুঁটলীর মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, সহসা মুখুটী আ পেছন থেকে বললে, বোঝ্‌লা লক্ষ্মণ, সময় কইর্যা এই আগাছা গুলান সাফ করন দরকার।

—তোমারে বাঘেও খাইবো, সাপেও খাইবো; বোঝছো?

মুখুটীর চোখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল, তুমি ভাবলা, আমার কথাই-

আবার একখানা ট্রাক এসে দাঁড়াল পাশের রাস্তার উপরে। ভীড় কা সবাই গিয়ে দাঁড়াল সেখানে।

—এখানে কতজন লোক আছে?

ড্রাইভারের পাশের একজন বললে, মোট বিয়াল্লিশ, বড়ট সাতাশ, ছো পনেরো।

ড্রাইভার কি একটা ইসারা করল।

—যে যার পাত্র নিয়ে এসো, রেশন নিয়ে যাবে। জল্‌দি।

রেশন বেঁটে দেওয়া হল,—পাঁচ পোয়া চাল, দেড় পোয়া আটা। কাপড়ের ফালিটা পেতে দিয়ে প্রশ্ন করল, তেল, লবন?

—ওঃ, তেল, লবন? মসলা পাতি? বলি, এর চোট সামলা আমাদের কি দশা হয় তার নেই ঠিক। ড্রাইভারের দিকে চেয়ে আবার ব পড়েছ তো হে আজ ফুড মিনিষ্টারের ষ্টেটমেণ্টটা?

ড্রাইভার লোকটি তখন মুখের বিড়িতে অগ্নি সংযোগ করছিল।

রেশনে তেল-লবন দেওয়া হয়নি। তা তারা দূরের কোন্ এক দো

থেকে কিনে আনে; সকালে খুব ধুমধামের সঙ্গে উনুনে আগুন পড়ে, রান্নাবান্না হয়—কমবেশী সবাই কিছু না কিছু খায়। ওরা অবশ্য, খাওয়া হয়েছে কিনা, জিজ্ঞাসা করলে বলে, হঃ, আইজকার মত জামিন দিছি। তারপর সারাদিন এঘর ওঘর করে কাটায়। ছোটরা খেলাতেই মত্ত থাকে বেশী। বাইরের উঠানটা মুখুটীর কথামত পরিষ্কার করা হয়েছে তার পরদিনই। তাই বেশ ভালই আছে তারা। মেয়ে মহলে ঝগড়া-বিবাদ, সুখদুঃখের কাহিনী নিয়ে আলাপ-বিলাপ, বাইরের ছুটো বাজে গল্প—সবই চলে। বুড়োরা একরকম নির্বিকার আছে; তাদের অন্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাইরে লোকের সন্দেহ জাগতে পারে, এমনিই তাদের ভাবলেশহীন চলা-বলা কথা বার্তা, সব কিছু।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে তাদের, যারা যুবকের পর্যায়ে পড়ে,—কিশোরও আছে কয়েকজন এর মধ্যে। বাপ দাদাদের তারা দেশে-গাঁয়ে একরকম দেখে এসেছে যার কণামাত্র অবশেষও এখানে তাদের চোখে ধরা পড়ে না। তারা বিস্মিত হয়, এ ওর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকে।

—ফ্যালায় আইজ বাজারে যায় নাই বুঝি?

—নাঃ।

—নাঃ। এই ছালি (ছাই) মুখে দ্যাওন যায়? থুঃ।

সেই সব মানুষগুলো নির্বিকার চিত্তে খেয়ে ওঠে, তা' সে রান্না যাই হোক। "ক্যাসারা" দেখে দুঃখ পায়, আড়ালে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

তাই তারা এই অবস্থাকে বরদাস্ত করতে ইতস্তত করে, সহরে গিয়ে এখানে সেখানে ছোটাছুটি করে বেড়ায়, যদি স্বাবলম্বনের কোন বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা সফল হয় নি।

খেলা-ধুলা, হাসি-গল্প, আশ্বাস-হতাশা—সবমিলে উপ-জনপদের জীবন প্রায় স্বাভাবিক খাতেই বয়ে চলল।

একদিন সকালে জনচার ভদ্রলোক এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করল, এটা নগর ক্যাম্প?

—হঃ।

তাদের একজন বলল, আমরা কলকাতার সেবাসঙ্ঘ থেকে আসছি। আপনাদের সঙ্গেই থাকব। সঙ্ঘ থেকে এখানকার সব দেখা-শোনার ভার পড়েছে আমাদের ওপর।

—অঃ।

কোনের দিকে ছোট ঘরখানায়, যেথানা এখনো খালি পড়ে আছে সেখানে তারা নিজের গরজেই বাসের বন্দোবস্ত করে নিলেন। একসময় ট্রাকে করে তাদের বিজ্ঞানাপত্র, নিত্যব্যবহার্য টুকিটাকি জিনিসপত্র বোঝাই ছুটো স্যুটকেশ এবং সপ্তাহের রেশন পৌছে দিয়ে গেল। তারা জমিয়ে বসলেন।

মাহিন্দর একজনকে প্রশ্ন করল, অরা ক্যান্?

— আউক না, ভলান্টিয়ার।

কে যেন বলে বসল, ক্যান্, প্রয়োজনটা কি?

—অরাই জানে। সরে গেল সে সেখান থেকে।

মাহিন্দর বললে, আমরা কি পোলাপান, না ডাকাইত, যে খবরদারী করন লাগবো?

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে ওদিক থেকে সেই ভলান্টিয়ারদের একজন চেঁচিয়ে বলল, শুনুন আপনারা, আজ বিকেলে আমরা এখানে একটা বৈঠক করতে চাই। আপনারা যে যার কাজকর্ম সেরে নিন। সবাই উপস্থিত থাকবেন দয়া করে।

মাহিন্দর নিম্নস্বরে উচ্চারণ করল, কাজকর্ম সেইরে নিন কামের তো আর অন্ত নাই! হুঁঃ!

বিকেলে একজন-ত্নজন করে পুরুষের প্রায় সবাই গিয়ে উঠানের মাঝখানে জমা হল। কি নিয়ে বৈঠক হবে, তা এখনও তারা ধারণা করে উঠতে পারেনি। ভলান্টিয়ার কজনও এসে গেল।

—আজকের এই বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটি বলতে গেলে, আমরা এখানে যারা আছি তাদের সবার সুবিধা-অসুবিধা, ভালমন্দ সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনার জন্তেই এই বৈঠক। আশা করি সবাই প্রাণ খুলে আলোচনায় যোগ দেবেন। তাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। সহসা মাহিন্দর বলে উঠল, প্রাণ তো আমরা খুইলাই আছি। কিন্তু—। কথা শেষ হল না, লক্ষ্মণ ধমক দিয়ে উঠল, আঃ মাহিন্দর!

মাহিন্দর চুপ করল।

—এখন বলুন, আপনাদের কি অসুবিধা হচ্ছে এবং কি করলে তা দূর হয়? বক্তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ভীড়ের মধ্যে মাহিন্দরের উপর নিবদ্ধ রইল।

লক্ষ্মন হুঁকাটি পাশের একজনের হাতে দিয়ে একবার গলাটা পরি

করে নিল। তারপর বললে, আমাগো কাম দেন। বিনা কামে আর থাকতে পারিনা। পোলাপানগুলা সহরে যায়, ফিরা আসে, কাম নাই। রেশন নিবার কালে লজ্জায় মাথা কাটা যায়, যেন্ ভিক্ষা নিতেছি। আমরা তো ভিক্ষুক ছিলাম না; খাট্ছি, খাইছি। অখনও তাই চাই। আপনারা আমাগো কাম দেন।

সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। উঠানের মাঝখানে জমায়েত লোকগুলোর কালো কালো মাথা অন্ধকারে আবছা দেখা যায়। কোন ঘরেই আলোর লেশমাত্র নেই। মেয়েরা দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, পূর্ণ মনোযোগে তাদের পুরুষদের কথা-বার্তা শুনছে।

—আর কেউ কিছু বলবেন?

এতক্ষণে মাহিন্দর সুযোগ পেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পুতির কথার পর আর কিছু কওনের নাই। আমাগো কাম কাজের বন্দোবস্ত কইর‍্যা দেন, বশ্। মাহিন্দর বসে পড়ল।

প্রথম বক্তা উঠে দাঁড়াল, আপনারা কাজ চাইছেন, ভালই। বিনাকাজে বসে খাওয়া খুবই অন্যায়। কিন্তু কাজ কোথায়! খবর রাখলে জানতেন, কাজ নেই বলে কত লোক—যারা চিরদিন এখানে বাস করে এসেছে—সেই রকম কত লোক বেকার বসে আছে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন প্রশ্ন করল, কাজ কি সত্যিই নেই? উচ্চারণের অপরিচিত ভঙ্গি উপস্থিত শ্রোতাদের চঞ্চল করে তুলল। তাদের মধ্যে কে আছে এমন লোক? কিন্তু অন্ধকারে তারা ঠিক করে উঠতে পারল না, প্রশ্নকর্তা কে।

বক্তার মধ্যেও কিছুটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল, লক্ষ লক্ষ লোককে দেবার মত কাজ যে সত্যিই নেই তা আপনারা যদি একদিন সহরে গিয়ে খোঁজ করেন তবে বুঝতে পারবেন।

এবারে মাহিন্দরের ভাইপো বসন উঠে দাঁড়াল, একটু ইতস্তত করে বলতে শুরু করলে, ক্যান্ যে এই কথা কন্, বুঝিনা। কাইল গেছিলাম মেটিয়াবুরুজ। এক কলের সামনে গিয়া দেখি মিটিং হইতে আছে। বক্তা কইলেন, "সব কাজে ফিরা যাও। এই ত্নর্দিন, যখন বেশী মাল পয়দা কইর‍্যা কাপড়ের দাম কমান দরকার তখন হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ করনডা দেশের লগে বেইমানী।" আমি জিগাইলাম, কি হইছে রে দাদা। তারা আমারে কইল,

"কোম্পানীর গুদামে নাকি মেলা মাল জইম্যা আছে, কাজ কম, তাই লোক ছাটাই করবে। আমরাও কইছি, ছাটাই হইতে দিমুনা। কাম বন্ধ কইরা দিছি।"—তা আমি কই, কামের অভাব কি ? খাওনের অভাব, পরনের অভাব, আছেডা কি ? নাই, নাইইতো শুনি কেবল। আমাগো কয়েন, ব্যবস্থা কইরা দেন—কাম করি, ত্থাশের দুঃখ ঘুচুক।

সমর্থনসূচক গুঞ্জনধ্বনিতে রাত্রির নিস্তব্ধতা কেটে গেল। প্রথম বক্তা চঞ্চল ভাবে উঠে দাঁড়াল, থামুন, আপনারা চুপ করুন। দেশের যে দুর্দিন, তাতে কোন সন্দেহ আছে কি আপনাদের ? আপনাদেরই মত হাজার হাজার লোক এখানে এসে ভীড় করছে, কাজ দাও, খাবার দাও, থাকার আস্তানা দাও। কিন্তু কোথা থেকে দেবে বলুন ? একটা না একটা গণ্ডগোল তো গেলেই আছে। অবস্থাটা একটু থিতোতে দিন !

আবার সেই অচেনা কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, খাওয়া পরার কোনও ব্যবস্থা না হলে অবস্থা থিতোবে না।

সবাই আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। বক্তা বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি, পঞ্চমবাহিনী আপনাদের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। সাবধান থাকবেন আপনারা এবং কিছুদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন তো আর বিদেশী নেই ! আর দেশের লোক দেশের জন্যে করবে না তো কি ! অপেক্ষা করুন, একটু ধৈর্য ধরুন। কিন্তু আপনারা সাবধান থাকবেন, বাইরের লোক আপনাদের নিয়ে গণ্ডগোল বাধাতে চাইছে।

বৈঠক শেষ হয়েছে; দুটি ছেলে অন্ধকারের গা ঢাকা দিয়ে ক্যাম্পের গেট পার হয়ে গেল।

রাত্রি বেশী হয়নি। খাওয়া দাওয়ার পর ছোট ছোট আড্ডায় লোকগুলো বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই তারা আলোচনা করছিল, মাঝে মাঝে যে লোকটা অদ্ভুত সব প্রশ্ন করছিল, সে কে তাকে তারা কোন দিন দেখেনি। হঠাৎ সে এখানে এলোই বা কেন ? কিন্তু কোন হদিশ মেলেনি। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ঘরোয়া কথায় ফিরে এসেছে তারা।

লক্ষ্মণ, মাহিন্দরের উষ্মাসূচক মন্তব্যের জন্যে তাকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে। যারা খাইয়ে বাঁচাচ্ছে তাদের সঙ্গে বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মাহিন্দর কিন্তু সহজে ছাড়েনি; বলেছিল, খাওয়াইয়া বাচায় নাই।—ভিক্ষা দিয়া বাচাইছে।

পরদিন বিকেলে আর কয়েকজন লোক এল, বললে তারাও ভলান্টিয়ার। যখন তখন ক্যাম্পের বাইরে যাওয়া—বিশেষ কারন না-দেখিয়ে নিষিদ্ধ হল। লক্ষ্মণ প্রশ্ন করল, এডা কি ?

মুখুটী উত্তরে বলল, বাইরের বদমাইস যাওয়া আসা আরম্ভ করছে।

মাহিন্দর কিন্তু সহ্য করতে পারল না; সোজা তাদের একজনকে ধরে প্রশ্ন করে বসল, আমরা কি জেলের কয়েদী ?

লোকটারও বোধহয় মেজাজ ভাল ছিল না, চোখ গরম করে বললে, ঠেঙানি খাবার ইচ্ছে হয়েছে, না ?

মাহিন্দর চুপ করে গেল, কিন্তু মনটা কেমন ভারী হয়ে রইল সেই থেকে।

দুদিন বাদে গেটের দিক থেকে হৈ চৈএর শব্দ শুনে লক্ষ্মণ, মুখুটী এবং আরও কয়েকজন এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নবাগত ভলান্টিয়ারদের একজন বললে, এই তো এসে গেছে ওরা। বলুন, আপনারা কাকে চেনেন এরমধ্যে।

দু'জন অপরিচিত লোক গেটের ভিতর ঢুকতে চেয়েছিল কাজ আছে বলে। কিন্তু পারেনি, ভলান্টিয়াররা ধরে ফেলেছে। তারা বলছে, এখানে তাদের লোক থাকে, দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে। কিন্তু ক্যাম্পের প্রায় সবাই সেখানে হাজির থাকা সত্ত্বেও তারা কাকে চেনে বলতে পারছে না। মুখুটী লক্ষ্মণের কানে কানে বললে, বদমাইস।

—চুপ কর। লক্ষ্মণ ধমক দিল।

ভলান্টিয়াররা ঠিক করছিল কেমন করে এদের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে এই বে-আইনী প্রবেশের জন্যে। এমন সময় ভীড় ঠেলে মাহিন্দর এগিয়ে এল, কি হইছে ?

ঘটনাটি শুনে নিয়ে মাহিন্দর বেশ জোরের সঙ্গে বললে, হ, ওনারেতো আমি চিনি। আমাগো গদাধরের জামাই। তুমি দেখ নাই, লক্ষ্মণ পুতি ? নাঃ, তুমি দেখবা ক্যামনে, ছিলানা তখন তুমি। অপরিচিত দুজনের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে কি খবর, আছেন ক্যামন ? চলেন ঐ দিকে। বলে তাদের একজনের কাঁধে হাত দিয়ে পরমাত্মীয়ের মত তাদের নিয়ে গেটের বাইরে চলে গেল। উপস্থিত ক্যাম্পবাসীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। মুখুটী চেঁচিয়ে বললে, মাহিন্দর, তুমি কিন্তু ভাল করলা না।

মাহিন্দর তার কোনও জবাব না দিয়ে সেই লোক দুটিকে নিয়ে এগিয়ে চলল, আপনারা কি শোনেন নাই নতুন নিয়ম, গেট দিয়া যখন-তখন যাওন-আসন নিষেধ।

—না তো। কবে থেকে করেছে এই আইন ?

—পরশু।

তারপর প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে মাহিন্দর ক্যাম্পে ফিরল। দেখা হতেই লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করল, অরা কারা ?

—কমু অনে।

মুখুটী একবার সন্দেহজনক ভাবে মাহিন্দরের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে গেল।

পরদিন দুপুর গড়িয়ে গেছে। দিবানিদ্রার সময় অতিবাহিত। দু'একজনকে তাই ক্যাম্পের এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছিল। ছেলেরা তখনও উঠোনে নামেনি।

এমন সময় বসন সহর থেকে ফিরে এল। এইখানে বসেই সে খবর পেয়েছিল, কোন্ এক জুট মিলে লোক নেবে। গিয়েছিল সেখানে। কিন্তু দেখেই এল শুধু, চাকরী হয় নি। অর্থাৎ সে চাকরী বসন করতে পারবে না। কেন না মিলের পাঁচ শো লোককে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কোম্পানীর আইন মানেনি বলে। কোয়ার্টারেও তাদের থাকতে দেওয়া হয়নি। কামরাগুলো তছনছ করে দিয়ে গেছে কোম্পানীর লোকেরা। এখন সেই শূন্য স্থানে নূতন লোক ভর্তি করা হবে। কিন্তু বসন তা পারবে না। বলতে বলতে বসনের গলা ধরে এল, তাগো দিকে চাওন যায়না, বোঝলা ? ঘরের মাইয়া মানুষগুলো পোলাপান লইয়া রাস্তায় পইড়া রইছে। নতুন লোক গ্যাখলে ফ্যালফালাইয়া চাইয়া থাকে তাগো দিকে—মুখের গ্রাস খাইতে আইছে বুঝি। থুঃ অমন চাকরী মাইনসে করে ?

ভীড় করে অনেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে বসনের বর্ণন শুনছিল। একজন প্রশ্ন করলে, হারামজাদারা অগো ঘর ভাঙলো, কিছু কইথে পারল না অরা ?

বসন কেমন একটা উৎসাহ অনুভব করল যেন, একটু চাপা স্বরে বললে, কইথে গেছিল, তাথে তিনজনের মাথা ফাটছে, দশ জন ফাটকে গেছে। উপস্থিত শ্রোতারা মনে মনে কি ভাবলে তা তাদের স্থির দৃষ্টি থেকে টের পাওয়া গেল না।

সেদিনের সেই বক্তা হঠাৎ কোথা থেকে এসে প্রশ্ন করলে, তুমিই তো গিয়েছিলে আজ কাজের জন্যে আমি যেখানে বলেছিলাম ! কি হল, ঠিক হয়ে গেছে তো সব ?

—নাঃ। অমন চাকরী মাইনসে করতে পারে না, বোঝলেন ?

—হুঁঃ।

রাত্রে মাহিন্দর লক্ষ্মণকে আড়ালে ডেকে বললে, পুতি, সেই লোক দুইজনের লগে দেখা করবা ?

লক্ষ্মণ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলে, ক্যান, কি কামে ?

মাহিন্দর কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করলে, না, এই তুমি জানতে চাইছিলা কিনা অরা কারা, তাই।

—তা হউক। ওই হাঙ্গামার মধ্যে আমার কোন কাম নাই। লক্ষ্মণ চলে গেল সেখান থেকে।

কি ভেবে মাহিন্দর শেষ বারের মত বললে, তাগো আমি ডাকাইছি। কথা কইলে পারতা কিন্তু, পুতি।

লক্ষ্মণ তার কোন জবাব দিল না।

পরদিন সকালে মাহিন্দর সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল, আগামী সপ্তাহ থেকে রেশন বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বাস অনেকেই করল না, কিন্তু কেমন একটা অজানা আতংক সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এবং তার জের চলল অনেকক্ষণ। দেখা হতে এ ওকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে, কি শুনি রে ভাই ?

—হ, শোনলাম তো মাহিন্দরের কাছে। তারপর তাই নিয়ে সক্ষোভ আলোচনা, অখন বাকী রইল ঘরখান, না, কি কও ?

—তাই তো দেখি।

এবং ক্রমে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল ক্যাম্পের মধ্যে।

বিকেলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যখন তারা রেশন-বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে সক্ষোভ আলোচনায় মত্ত ছিল, তখন তিনজন ভলাণ্টিয়ার এসে প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে এখানে ? এত হট্টগোল কেন ?

একজন ভয়ে ভয়ে বললে, শোনতেছি রেশন বন্ধ কইর‍্যা দিবো !

আর সবাই উত্তর শুনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে চেয়ে রইল ভলাণ্টিয়ারদের দিকে। কি উত্তর আসে, কে জানে !

—হ্যাঁ, আমরাও শুনেছি সেইরকম। কিন্তু এখনও তার দেরী আছে। আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন ?

লক্ষ্মণ বললে, ভয় কি পাই সাধে ! কাম-কাজ কিছু নাই। অখন ওই দুই-মুটি চাউলও যদি বন্ধ হইয়া যায়—।

—বন্ধ হওয়ার আগে আপনাদের জন্যে বন্দোবস্ত একটা করে দেবে নিশ্চয়ই।

—তাই হউক।

আবহাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এল ক্রমে।

কিন্তু রাত্রে মাহিন্দরের সঙ্গে লক্ষ্মণ এবং মুখুটীর তুমুল তর্ক বেধে গেল।

মাহিন্দর বললে, ছালির বন্দোবস্ত হইবো। সব নিজেগো প্যাটের মধ্যে লইয়া বইশ্যা আছে; বন্দোবস্তটা করবো কি!

লক্ষ্মণ যুক্তি না পেয়ে রেগে বললে, তোমার থিকা তারা অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে। তুমি এর বোঝ কি? কইছে যখন কিছু একটা হইবোই।

—সেই আনন্দেই থাক।

এতক্ষণে মুখুটী মুখ খুললে, মাহিন্দররে যেন একটু গরম গরম দেখা যায় আইজ-কাইল!

মাহিন্দর মুখুটীর দিকে কটমট করে তাকাল, তোমারে আমি চিনি। তুমি চুপ কর।

শুতে যাবে এমন সময় বাইরে কে যেন মাহিন্দরকে ডাকল, সেখানে এসে মাহিন্দর বললে, কি আমারে ডাকেন!

এসেছিল দু'জন ভলাণ্টিয়ার। একজন বললে, আপনাকে আজকাল একটু গরম দেখা যাচ্ছে। কি বল! পাশের একজনের দিকে চাইল সে।

—আমি! ক্যান্, কি হইছে?

—কি হয়েছে সে আপনিই ভাল জানেন। কিন্তু ওই মেজাজ আর শয়তানি নিয়ে এই ক্যাম্পে বেশীদিন থাকতে পারবেন না, এই বলে দিলুম, মনে রাখবেন। আচ্ছা—। তারা চলে গেল।

মাহিন্দর ঘরে ফিরে এল; দাঁতে দাঁত চেপে বললে, হারামজাদা শয়তান!

ভলাণ্টিয়ারদের সব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে রেশন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল তিনদিন পরে। সবাই সেদিন সকাল থেকে উন্মুখ হয়ে ছিল, এই ট্রাক আসে বুঝি। ঝোলাঝুলি পরিষ্কার করে সবাই গেটের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ফাঁক না পড়ে। সকাল গড়িয়ে দুপুর এল। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে; কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়েছে, একথা স্বীকার করতে পারল না কেউ। তারপর একসময় সবাই মনে মনে বিশ্বাস করে বসল, কোন কারণে এবেলা আসতে পারেনি, বিকেলে আসবে।

মাহিন্দর কিন্তু কোন কথা বলেনি কারুর সঙ্গে সকাল থেকে। ঘুরে ঘুরে সবার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সে। সন্ধ্যার একটু আগে সে লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, পুতি, রেশন আইসে নাই।

লক্ষ্মণ তার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, মজা দেখ নাকি তুমি?

মাহিন্দর আর সহ্য করতে পারল না, চোখ দুটো তার ছল ছল করতে লাগল, পুতি, তুমিও আমারে ওই কথা কও!

—ওকি, কান্দ ক্যান্? লক্ষ্মণ একটু এগিয়ে গেল তার দিকে।

কান্নার বেগটা সম্বরণ করে মাহিন্দর বললে, একত্তর আইছিলাম; দুঃখ আইলে সকলে ভাগ কইর্যা লইতে পারুম, ভরসা ছিল। কিন্তু,—একটু থেমে আবার বললে, মুখুটীর কথায় ভলাণ্টিয়াররা আমারে শাসাইয়া গেছে, আমি নাকি বজ্জাৎ শয়তান।

—কবে কইছে।

উত্তর না-দিয়ে মাহিন্দর বলে চলল, অখন আমি বাঁচি ক্যামনে? তোমারে কইথে গেলে দাবাড় (ধমক) দ্যাও, মুখুটী অগো লগে ফুলিফাসি করে। আর আছে কেডা এখানে যার লগে পরামর্শ করন যায়!

লক্ষ্মণের অন্য রূপ প্রকাশ পেল; সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, মরদের বাচ্চা, এই জন্যে দুঃখু পাও ক্যান্। মুখে প্রবোধ দিলেও প্রিয়জনের আঘাতে ক্রোধের চেয়ে দুঃখ ও অভিমানই যে বেশী হয় সেকথা লক্ষ্মণ জানে। তাই সে সেখান থেকে সরে গেল মুখুটীর এই কারচুপির আঘাতটা সইবার জন্যে।

পরদিন সকালে লক্ষ্মণ বসনকে সঙ্গে নিয়ে ভলাণ্টিয়ারদের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, রেশন তো কাইল আইসে নাই, শোন্‌ছেন বোধ হয়?

—হাঁা, শুনেছি। কিন্তু কি করতে পারি বলুন আমরা?

লক্ষ্মণ আর কোন কথা খুঁজে পেল না। বসন বললে, আপনারাই কইছিলেন বন্দোবস্ত একটা কিছু—।

কথা শেষ হল না, কর্কশ কণ্ঠে একজন বলে উঠল, কাজ কি আমরা পয়দা করে দেব? "কাম দেন, কাম দেন"। অত যদি গরজ তো নিজেরা জোগাড় করে নিলেই পারেন!

লক্ষ্মণ এবং বসন গম্ভীর মুখে ফিরে এল।

মুখুটীকে একবার লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করেছিল, ও মুখুটী, অখন করি কি কও দেখি; আইস, ঘরে আইস।

মুখুটী মুখ ব্যাজার করে বলেছিল, আমি আর কি কমু!

খেয়ে না-খেয়ে সেদিনটা কেটে গেল কোন রকমে। ঝড়ের মেঘ যেন

ক্যাম্পের ওপরটা ছেয়ে ফেলেছে, এমনি থমথমে ভাব। রাত্রে সবাই আটচালার মধ্যে যে যার আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। মাঝে, মাঝে কোন্ এক অবোধ শিশুর ক্ষুধার্ত চীৎকার ক্যাম্পের মধ্যে সাড়া দিয়ে জানিয়ে গেল, রেশন আসেনি, তাই ওদের খাওয়া হয়নি আজ।

অন্ধকার গেট দিয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময় কে একজন চীৎকার করে বললে, কে যায় ?

মাহিন্দর বললে, আইজ্ঞা আমি।

ভলান্টিয়ারটি এগিয়ে এসে বললে, বড় খুশী দেখা যাচ্ছে আজ।

মাহিন্দর হেসে বললে, সত্যই, সারাদিন পর দুটি চাউল যোগাড় করছি, কি খুশীই যে লাগতে আছে আইজ। বোঝলেন, খাইতে আমি বড় ভালবাসি। হেঃ হেঃ, তা পোড়া কপাল!—

মাহিন্দরকে এই মেজাজে কেউ বড় একটা দেখেনি কোনদিন। লোকটি তার কথা বেশ মনোযোগের সঙ্গে উপভোগ করছিল। মাহিন্দর গেটের দিকে পিছন ফিরে বললে, ওটা বন্ধ কইর্যা দ্যান।—রাত্তির কত হইছে ?

—প্রায় নটা।

—আচ্ছা, যাই। আবার এগুলান ফুটানের বন্দোবস্ত করতে হইবো। মাহিন্দর চলে গেল। অন্ধকারে একবার ভলান্টিয়ারটির দিকে ফিরে দেখল, সে সত্যিই গেট বন্ধ করতে যাচ্ছে। মাহিন্দর সোজা লক্ষ্মণের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকার বারান্দায় উঠে কাকে উদ্দেশ করে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, আসেন ভিতরে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে নিম্নস্বরে ডাকল, পুতি ?

—এই যে। অন্ধকারে লক্ষ্মণের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

—আর আছে কেডা ?—বসেন; মেঝেটা দেখিয়ে দিলে কাকে। লোকটি বসে পড়ল।

—আলো জ্বালি ? লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করল।

—রাখ, বলে মাহিন্দর বাইরে চলে গেল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে ভারী নিশ্বাস পতনের শব্দ কেমন একটা অজানা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বলে মনে হল সবার কাছে।

লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করল, আপনারে কেউ দেখে নাই তো ?

—নাঃ। নবাগত লোকটি উত্তরে বললে।

মাহিন্দর ফিরে এল, জ্বালাও দেখি বাত্তিডা। ডাকাইছো কারে কারে ?

লক্ষ্মণ আলো জ্বালতে জ্বালতে বলল, বসন, গদাধর, গঙ্গাপদ আর রসিকরেও জানাইছি।

আলোতে সবাই দেখল, নবাগত লোকটির বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। পরনে ময়লা কাপড়, গায়ে খাকী সার্ট, দোহারা চেহারা, ময়লা রঙ—কিন্তু চোখদুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জল।

মাহিন্দর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে, আরম্ভ করেন আপনি।

অন্ধকার রাত্রে সারা ক্যাম্পটা ঘুমন্ত পুরীর মত মনে হতে লাগল। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মাঝে মাঝে ভলান্টিয়ারদের ঘর থেকে উচ্চস্বরে কথাবার্তা এবং হাসির শব্দ ভেসে আসতে লাগল—তাস নিয়ে বসেছে বোধ হয় তারা।

মাহিন্দর শেষ কথা বলল, যাও তোমরা। মনে থাকে যেন, কাইল সকালে। কেউ যেন বাকী না থাকে। আর কইও, একটু হেসে নিয়ে বললে, 'সবে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাই লাজ'। সাবধানে যাও।

পা টিপে টিপে সবাই বেরিয়ে গেল, লক্ষ্মণ, মাহিন্দর আর সেই নবাগত লোকটি ছাড়া।

ভোর রাত্রে মাহিন্দর বাইরে এসে একটু হকচকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বললে, পুতি, ব্যাটারা টের পাইছে।

—তাথে হইছে কি ? আমরা কি চুরী করতে চল্‌ছি ?

মাহিন্দর বোকার মত হাসলো।

সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ক্যাম্পের প্রায় সবাই উঠে পড়েছে। দাঁত মুখ ধুয়ে কোথায় যাবার জন্যে তারা প্রস্তুত হয়ে লক্ষ্মণের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

ভলান্টিয়ারদের একজন এসে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার আজ ? এই সাত সকালে—।

—হঃ, একটু সকাল সকালই লইছি! দূর তো কম না, প্রায় পাঁচ ক্রোশ, কি কও, তাই না! মাহিন্দর বললে।

—হঃ. ভীড়ের মধ্যে কে একজন সায় দিল।

ততক্ষণে আরও দুজন ভলান্টিয়ার সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজন বললে, আমি সেদিন বলেছিলাম, আপনারা সাবধান থাকবেন। বাইরের লোক গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টায় আছে! তা শুনলেন না আপনারা—

আরও কি বলতে যাচ্ছিল সে ; ভাঙ্গা গলায় কে একজন চেঁচিয়ে বলল, বাইরের লোকের গণ্ডগোল, না, ভিতরের গণ্ডগোল। আইজ দুইদিন প্যাটে কিছু দিই নাই ; আছি ক্যামনে কইথে পারেন মশায় ?

পরিবেশটা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। এমন সময় মাহিন্দর লক্ষ্মণের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে সেই বাইরের লোকটি, চল চল, এইখানে দাঁড়াইয়া গজালি কয়নের কাম নাই।

ভলাণ্টিয়ারদের একজন দৌড়ে গেটের দিকে চলে গেল। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় নেই। সরবে তারা এগিয়ে চলল। গেটের কাছাকাছি এসেছে এমন সময় পিছন থেকে ডাক শোনা গেল, মাহিন্দর, মাহিন্দর ! সবাই পিছন ফিরে দেখে, মাহিন্দরের বুড়ী শ্বাশুড়ী একটা লাঠি ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে সেদিকে। কাছে এসে বুড়ী মাহিন্দরকে আশ্রয় করে ক্লান্তি অপনোদন করতে করতে বললে, আমারে লইয়া যাবা না ? দুই দিন পুরা নাখাওয়া। আমারে লইয়া যাবা না ?

মাহিন্দর ব্যস্ত হয়ে বললে, তুমি যাবা কই ? থাক তুমি।

বুড়ী রাগতস্বরে বললে, ক্যান্‌, আমি থাকুম ক্যান্‌ ? ওই পোলাপানগুলান পর্যন্ত চলছে, আর আমি—।

—তুমি থাক। তাকে বাধা দিয়ে মাহিন্দর সবাইকে বললে, চল চল, আউগাও।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই শান্ত রইল না। গেটের কাছে আসতেই ভলাণ্টিয়াররা বাধা দিল, বাইরে যাওয়া নিষেধ।

—কার নিষেধ ? শতকণ্ঠে প্রশ্ন উঠল।

দ্বাররক্ষী আঙুল দিয়ে পাশে দণ্ডায়মান পুলিশের গাড়ীটা দেখিয়ে দিল। মেয়ে-পুরুষ সবাই সেদিকে চেয়ে দেখল। এবারে এতক্ষণের বাহ্যিক চাঞ্চল্য থিতিয়ে এলো ; কিন্তু তাদের চোখ-মুখের অবস্থা দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে বাইরের চঞ্চলতা থিতিয়ে গিয়ে মনের মধ্যে তা কঠিনতা প্রাপ্ত হচ্ছে। গঙ্গাপদ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, ক্যান, আমরা তো অন্যায় কিছু করতে চলি নাই !

গেটের বাইরে দণ্ডায়মান একজন ভলাণ্টিয়ার সক্রোধে চীৎকার করে উঠল, অন্যায় নয় মানে ? দল বেঁধে আপনারা শহরে চলেছেন হল্লা করবার জন্যে, আবার বলছেন অন্যায় নয় !

গঙ্গাপদ তেমনি ধীরস্বরে বললে, মাইয়ামানুষ, পোলাপান, বুড়া-গুড়া লইয়া আমরা চলছি হল্লা করতে ? মাথা খারাপ হইছে আপনাগো—ছাড়েন, পথ ছাড়েন।

মাহিন্দর সামনে এগিয়ে এসে বললে, আমাগো রেশনের ব্যবস্থা কইর‍্যা দ্যান, আমরা যামুনা। কিন্তু তা যতক্ষণ না হইতেছে—। চল চল, আউগাও।

দু'দলে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। মাহিন্দরের শ্বাশুড়ী ক্যাম্পের মধ্যে গেটের কিছুটা দূরে লাঠি ভর দিয়ে দেখতে লাগল, গেটের কাছে মারামারি শুরু হয়েছে। এরা আঘাত বাঁচিয়ে গেটের বাইরে যেতে চায়, ভলাণ্টিয়াররা আঘাত দিয়ে এদের যাওয়া রুখতে চায়। একসময় বুড়ী দেখল, একটি অচেনা লোককে ভলাণ্টিয়ারদের কজনে ধরাধরি করে নিয়ে গেল পাশের ওই গাড়ীটার দিকে। প্রশ্ন জাগল, তার মনে, ও কে ? কিন্তু প্রশ্নের নিরশন হল না। বসনকে একটু পরে সেদিকে ছুটে আসতে দেখে বুড়ী কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি হইছে ?

বসন চলতে চলতে উত্তর দিল, মাহিন্দর পুতিরেও ধইর‍্যা লইয়া গেছে।

কিছুক্ষণ পরে জানা গেল, মারামারিতে আঠার জন অল্প বিস্তর জখম হয়েছে। সেই বাইরের লোকটি ছাড়া আরও সাতজনকে ওই গাড়ীতে তুলে হাজতে নিয়ে গেছে, তার মধ্যে মাহিন্দর এবং আর কে কে আহত হয়েছিল।

গেটের সামনে ভীড় পাতলা হয়ে গেছে। ভলাণ্টিয়ারদেরও দেখা যাচ্ছে না সেখানে।

লক্ষ্মণের উপর: এতক্ষণ কারও নজর পড়েনি। সহসা গেটের একপাশ থেকে সে চীৎকার করে ডাকল, বসন আছো ? বসন এগিয়ে এলো তার সামনে, পুতি ? লক্ষ্মণের দিকে চাইলে ভয় করে। তার চোখের এতদিনকার চেনা সেই সস্নেহ দৃষ্টি কোথায় গেল ?

বসন জিজ্ঞাসা করল, কি কও ?

—যাবিনা তোরা, যারা আছোস্‌ ?

বসন কোন কথা বলতে পারল না। লক্ষ্মণ তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল। মাটি দিয়ে বাঁধান সড়কটা সোজা উত্তরে চলে গেছে, মিশেছে গিয়ে শহরের কোন্‌ পাকা সড়কের সঙ্গে। লক্ষ্মণ সেদিকে চেয়ে কি ভেবে নিল। তারপর দ্রুতপদে চলতে শুরু করল সেদিকে।

মাহিন্দরের শ্বাশুড়ী তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল,—অনেক আগে লক্ষ্মণ চলেছে রাস্তা ধরে। তার পিছনে বসন এবং আরও কে কে যেন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তার অনুসরণ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে।

সূর্য তখনও মাথার উপরে ওঠেনি। বুড়ী ধীরে ধীরে গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। ক্ষীণ দৃষ্টি মেলে মাটির দিকে চেয়ে দেখল, সেই যে গাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছিল এখানে, তার চাকার দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে মাটির উপর এবং কয়েক ফোঁটা রক্তও দেখা যায় বুঝি! একবার সে লক্ষ্মণদের দিকে ফিরে চাইল; এখন আর দেখা যাচ্ছে না তাদের। অনেক দূর এগিয়ে গেছে তারা। এবং ওই রক্তমিশ্রিত চাকার দাগটাও তাদের অনুসরণ করছে নিশ্চয়ই॥

—উমানাথ ভট্টাচার্য

মহান চীনা জনগণ জিন্দাবাদ!

(চীন-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতির উদ্বোধনী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন চীনের শ্রমিক আর চাষী আর বুদ্ধিজীবীদের গ্রাম এবং শহরের ইস্কুল মাষ্টারদের, ডাক্তারদের, কৃষি-বিজ্ঞানীদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর ছাত্রদের, যাঁরা নূতন সমাজের আশা-ভরসা।

আমরা, সোভিয়েটের মানুষ, যারা আজ আপনাদের অতিথি, সমাজের ঐ সব স্তরেরই সৃষ্টি। আমরা সিধেসাদা লোক, আমাদের বাপ-মা'রা জমি চষতেন, কলকারখানায় খাটতেন, চাষী-ছেলেমেয়েদের পড়াতেন এবং লড়তেন আপনাদের মতই। যাঁরা জনসাধারণের মধ্য থেকেই এসেছেন এবং জনসাধারণকেই দিচ্ছেন তাঁদের সমস্ত শক্তি, নরনারীর সেই বিশাল বাহিনীর প্রতি অভিনন্দন বহন করার চেয়ে বড় আনন্দ আমার কাছে আর কিছুই নেই।

চীনের মজুর-চাষীর একটি বিরাট কৃতিত্ব হলো এই যে, দেশের শিক্ষিত লোক জনসাধারণের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। সমস্ত জগতের পক্ষে ঐতিহাসিক চীনের এই বিজয় কেবল রাজনৈতিক বিজয়ই নয়—এটি চীনের সংস্কৃতির বিজয়। সংস্কৃতির মহান্ অর্থ নিহিত রয়েছে মানুষের প্রতি, মেহনতকারীর প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে, সার্বজনীন জ্ঞানবিস্তার এবং সর্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে, তা তাদের চামড়া যে রঙেরই হোক্।

জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি, মানবজাতির ঐশ্বর্যভাণ্ডারের প্রতিটি জাতির দানের প্রতি এই শ্রদ্ধার মধ্যে উহ্য আছে সমস্ত মানুষের ভবিষ্যতের জন্য প্রচণ্ড ব্যাকুলতা। কেউ যদি তার জাতির সেবক হয়, তার জাতিকে ভালবাসে, তাহলে তার সবচেয়ে বড়ো সুখ হলো সেই জাতিকে তার সম্পূর্ণ হৃদয়টি সঁপে দেওয়া, তাকে মানবসভ্যতার উচ্চতম শিখরে তুলে নিয়ে যাওয়া।

এখন আমার বয়স ৪৮; ছেলেবেলায় আমি একটি গ্রামে থাকতাম প্রিমোর্য়ে অঞ্চলে। যদি আমাদের নিজের নিজের দেশের বিশালতার কথা মনে রাখি, তাহলে সে অঞ্চল আপনাদের কাছ থেকে তেমন বেশী দূর হবে না। গ্রাম্য জেলেভিশারের ছেলে আমি, সর্বদাই স্বপ্ন দেখতুম কিভাবে বিদ্যার্জন করবো এবং আমার যেসব কমরেড পুরনো জার আমলে কোন সুযোগ পাননি, তাঁদের মধ্যে

সে বিষ্ণা কি করে প্রসাম্বিত করে দেবো। সোভিয়েট ক্ষমতা কেবল যে আমার সেই মনোরথ সিদ্ধিতে সহায়তা করলো তাই নয়, আমাকে লেখক হতেও সাহায্য করলো; এবং আমার ছেলেবেলাকার অধিকাংশ বন্ধুও শিক্ষিত লোক হয়ে পড়েছেন।

চীনে একদল তথাকথিত শিক্ষিত লোক ছিলেন, যাঁরা এমন কি ১৯১৯-এর তথাকথিত "সাহিত্যিক বিপ্লবে" অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা, অর্থাৎ যে গুটিকত লোকের কথা আমি বলছি, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাঁরা লুব্ধ হয়েছিলেন প্রতিক্রিয়া শিবিরের অসার সাফল্যের দ্বারা এবং স্থূল লাভের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ধরা প'ড়ে গিয়েছিল। চীনের জনগণের মধ্যে একজনও আর তাঁদের নাম মনে রাখেন না; আর আমরা এখন যারা বয়স্ক হয়েছি, যারা সপ্রেম আগ্রহে চীনের সংস্কৃতির বিকাশের ধারা অনুসরণ করছি, চীনের "সাহিত্যিক বিপ্লব"-এর কথা যারা ভুলিনি, যারা স্মরণ করি লু হ্‌সিন এবং তাঁর শিষ্য ও বন্ধুরা যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন জাতির প্রগতিশীল বিকাশের জন্য, আমাদের কারুরই এই দৈবাগত লোকগুলির নাম মনে নেই; অথচ মহান্ লু হ্‌সিন্‌-এর নাম অবিনশ্বর অক্ষরে খোদিত রয়েছে সেই সব নামের সর্ব-দেবায়তনে যাঁরা জগতের জাতিসমূহকে সুখ এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

এইসব লোক যাঁরা নিজেদের "সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি" বলে কল্পনা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আসলে অত্যাচারীদেরই মুখপাত্র ছিলেন, এবং আজ তাঁরা বিস্মৃত, কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের "সংস্কৃতি", অত্যাচারীদের "সংস্কৃতি" সংস্কৃতিই নয়। মানবসমাজের প্রধান লক্ষণ এ সংস্কৃতির নেই, যা হলো সামাজিক বিবেক এবং মানব-প্রেম। কিন্তু মহান্ লু হ্‌সিন যে সামান্য লোকটিকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন, যার দুর্বলতা এবং শক্তি তিনি ভালো করেই জানতেন, তাকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাদির জন্য মানবতাবাদী সাহিত্যের সর্বদেবায়তনে প্রবেশলাভ করেছেন। ঐ সমস্ত চীনা কবি, যাঁরা মনে করেন যে, বুর্জোয়া ইউরোপীয় সংস্কৃতির অধঃপতিতদের অনুকরণের তারতম্যের উপরই মানবসংস্কৃতিতে তাঁদের ভূমিকা এবং আসন নির্ভর করে, তাঁরা ইতি-মধ্যেই বিস্মৃত। তাঁদের আকাঙ্খিত যশের বদলে তাঁদের নাম ধুলোয় মিশেছে। অথচ কুয়ো-মো-জো, মাও তুন, তিঙ্ লিঙ্ এবং আরও অনেকের মত মহৎ মানুষ জগৎবিখ্যাত হয়ে পড়েছেন।

আমাদের মহান্ শিক্ষক লেনিন এবং স্টালিন আমাদের এই শিক্ষা দেন যে,

যত কৃতিত্বই আমরা অর্জন করি না কেন, আমাদের ক্রমাগতই শিখে যেতে হবে। মানবসংস্কৃতি সুন্দর কেবলমাত্র এই কারণেই যে, সার্বজনীন ঐশ্বর্যভাণ্ডারে জাতিদের যে পৃথক্ পৃথক্ দান তার মধ্যে যা কিছু মহত্তম এবং সর্বোৎকৃষ্ট তাই সে আত্মসাৎ করে। সাম্রাজ্যবাদীদের মাইনে করা লোকেরা চীনা জাতির মহান্ সংস্কৃতিকে "পশ্চাৎপদ" বলে মনে করতে চাইবে, কিন্তু চীনের বিজয়ী জনগণ মহান্ চীনা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীরা চীনের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু ভালো তা আবিষ্কার করবেন। চীনের উজ্জ্বল বিপ্লবী, চীনা জনগণের সন্তান এবং নেতা মাও সে তুঙ ঠিকই বলেছেন যে, চীনা জাতি ইতিহাসে উচ্চকোটির সভ্য-জাতি হিসাবে গণ্য হবে, কারণ, জনগণ, যারা নিজেদের ইতিহাসের নিয়ন্তা এবং উত্তরাধিকারী, তারাই কেবল বিচার করবে অতীতের সংস্কৃতিতে কি ছিল তাদের পক্ষে শুভকর, কি ছিল অশুভকর।

লেনিন এবং স্টালিন আমাদের শিখিয়েছেন যে, প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির মধ্যে দুটো সংস্কৃতি আছে,—একটির অস্তিত্ব প্রভুশ্রেণীর বিলাসের জন্য, অন্যটি খাঁটি সংস্কৃতি, জনগণের সংস্কৃতি, জনগণের বলিষ্ঠ ছাপ না পড়লে যার অস্তিত্বই অসম্ভব হতো। সাহিত্যের ক্ষেত্রে চীনা জনগণ শুধু তাঁদের মহান্ কাহিনী সাহিত্যেরই উত্তরাধিকারী নন, যে সাহিত্য অতীতে কংফুচির নীতিগ্রন্থে স্থান পায় নি। একথা চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে লু হ্‌সিনের সুবিদিত গ্রন্থ "চীনা কাহিনী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"-এ। যে সব শ্রেষ্ঠ লেখক সামন্ত মহলের লোক হলেও জনগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাঁদের রচিত অতীতকালীন সাহিত্যের অনেক জিনিসই চীনা জনগণ পুনরুদ্ধার করে জগৎকে দেবেন। আমাদের দেশে আমরা বেশীর ভাগ পরিচিত ৭ম থেকে ৯ম শতাব্দীর চীনা কাব্যের সঙ্গে। আমরা লি পো এবং তু ফুর সর্বোৎকৃষ্ট রচনার গুণগ্রাহী, এবং তাঁদের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি বলে আক্ষেপ করি। চীনা ক্লাসিক সাহিত্যের অল্প অনুবাদই আমাদের আছে, যদিও পো চু-ইর কিছু কিছু কবিতা আমাদের দেশে বেশ কয়েকবার অনুবাদ করা হয়েছে।

তাঁর "হুলিনের বুড়ো" যার মধ্যে চীনা চাষীর জীবনের প্রতি অমন গভীর সহানুভূতির সুর বেজেছে, "বুড়ো কয়লাখাদের কুলী", "কালো পাতালের ড্রাগন" এবং "আমি নিজের একটা গরম জামা বানিয়েছি", এই ধরনের কবিতার প্রতি আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সব সময়ই আকৃষ্ট হয়েছেন। এই কবিতাগুলির সবই জনগণের ভাবে অনুপ্রাণিত।

অনেক কিছুই আজো জীবন্ত কুও ্তুর রচনায়, যাঁর স্বদেশপ্রেমিক হৃদয় এবং অন্তিম উনবিংশ শতাব্দীর স্টাইল আমরা আয়ও সহজে উপভোগ করতে পারি। নিজের জাতির জন্য এবং সমস্ত জগতের জাতিসমূহের জন্য মহান চীনা সাহিত্যের এই সমস্ত গণতান্ত্রিক এবং জাতীয় স্বরূপ পুনরুদ্ঘাটন করবার আনন্দজনক সুযোগ পেয়েছেন আজ চীনা সাহিত্যিকেরা।

চীনা ক্লাসিক সাহিত্যকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করা বড় কঠিন। কিন্তু আমরা যারা সুন্দরের প্রেমিক, আমাদের জাতি এবং জগৎকে প্রাচীন চীনা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বোঝানোর জন্য কঠিনতম প্রয়াস করবো। আমরা এ পর্যন্ত চীনা ক্লাসিক সাহিত্যের অনুবাদের দিকে কেবল মাত্র প্রথম পাদক্ষেপ করেছি ভয়ে ভয়ে। আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, এই ক্ষেত্রে আমরা আরও অনেক বেশী কাজ করবো।

কিন্তু যা আমাদের সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে তা হলো চীনে নতুন সাহিত্যের বিকাশ। লু হশিনের রচনা যখন প্রথম রুশ ভাষায় অনুবাদ হয় তখন আমার বয়স খুব কম। তাঁর মাতৃভাষার শক্তির প্রতি পূর্ণ সুবিচার করা অত্যন্ত কঠিন, এবং এখনো আমাদের দেশে চীনাভাষা জানা লোক খুবই কম। আপনাদের পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই তেমন লোকের সংখ্যা অনেক হয়ে পড়বে। ভাবচিত্রের (ইমেজারির) শিল্পে কিছুটা দখল থাকায়, আমার একবার সুযোগ হয়েছিল লু হশিনের আক্ষরিক অনুবাদকে, চীনা কবি এমি হসিয়াও-এর সাহায্যে স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত করবার (Adapt করবার)। এ কথা ভাববেন না যে, আমরা মহান চীনা ক্লাসিক সাহিত্যের তথাকথিত সাহিত্যিক পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলাম। অপর পক্ষে আমরা চেষ্টা করেছিলাম, লু হ্‌সিনের প্রতিভার প্রতি অল্পবিস্তর সুবিচার করতে পারে এমন সব সঠিক ব্যঞ্জনা রুশ সাহিত্যিক ভাষা থেকে খুঁজে বের করবার। লু হ্‌সিনের মতন জগৎবিখ্যাত লেখক কর্তৃক আমার একটি পুরনো রচনা "উনিশ জন" নামক উপন্যাসের অনুবাদের প্রত্যুত্তরে আমি এই বিনীত প্রয়াস করেছিলাম। চীনের সাহিত্যিকদের আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমাদের যতোখানি শক্তি আছে তা নিয়োগ করবো, জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী লু হ্‌সিনের চমৎকার রচনার যথাসম্ভব মূলানুযায়ী অনুবাদ করবার জন্য।

চীনের নূতন সাহিত্যের প্রতি আমাদের সোভিয়েট জনগণ গভীরভাবে আগ্রহশীল। আমাদের দেশের অগ্রগামী নরনারীরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে মা-

তুন'এর উপন্যাস "ঊষার আগে" পড়েছেন; আমাদের সাহিত্যিক পত্রিকাগুলোয় তাঁর বিচ্ছিন্ন গল্প এবং রচনা যা বেরিয়েছে তার কথা তো বাদই দিলাম। আমরা কো-মো-জোর "বীরের কাহিনী" অনুবাদ করেছি। আমি এ কথা বলতে পারি যে চীনা শিল্পের এই চমৎকার প্রতিনিধি এবং উৎকৃষ্ট জননেতা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিঙলিঙের উপন্যাস "সাঙ্‌গান নদীর উপরে দিবালোক" এবং চাও শুলির গল্প "লিসিয়াচুয়াঙের পরিবর্তন" চীনা জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে বুঝতে অনেক সাহায্য করেছে আমাদের। শু চ'উন্-এর "বিদেশে" আমাদের কাছে খুব জনপ্রিয়।

যদিও চীনা রচনার অনুবাদ আমরা অল্পই করতে পেরেছি, তবুও কতজন চীনা লেখকের পৃথক পৃথক্ রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। কমরেড্‌স, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, রুশ ভাষায় আপনাদের সমস্ত সর্বোৎকৃষ্ট রচনায় অনুবাদ আমরা করবো।

আমাদের দেশের,—এবং এ দেশ একটি নতুন দেশ – ৩২ বছরের অভিজ্ঞতা মহৎ সাংস্কৃতিক বিকাশের। আমাদের দেশে জনসাধারণ সংস্কৃতির স্তরে উঠেছেন। মানবীয় ইতিহাসে যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে এবং জগতের প্রগতিশীল মানুষ যা কিছু সৃষ্ট করছে তার মধ্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট তা তারা পরম আগ্রহে আত্মসাৎ করে। অতএব, কমরেড্‌স, আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ কেবল তাই আপনাদের উপহার দেব না, চীনের বহুশতাব্দীব্যাপী সম্পূর্ণ বিকাশকেও নিবিড়ভাবে জানবো এবং বিশেষ করে চীনা জনগণ জগৎ-সংস্কৃতির বিকাশে যে নূতন উপাদান যুগিয়েছেন তাকেও জানবো।

চীনা বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানাতে পেরেছি বলে আমি বড় সুখী হয়েছি, কারণ চীনা ও রুশ জনগণের চরিত্রে অনেক মিল রয়েছে। এখানে যে কটা দিন কাটালাম আমাদের হৃদয়ে তা চিরদিন একটি সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। আপনারা এবং আমরা বিশাল দেশের বাসিন্দা। আমাদের জনগণ অসংখ্য। ইতিহাস আমাদের আত্মীয় একটি উদার বিস্তৃতি এবং সুযোগ আরোপ করেছে। বিজয়ী হয়ে আমরা জগৎসংসারে প্রবেশ করলাম।

—মহান্, শক্তিমান্, বীর, পরিশ্রমী চীনা জনগণ জিন্দাবাদ!

—যাঁরা জনগণকে জ্ঞানদান করছেন সেই চীনা বুদ্ধিজীবিগণ জিন্দাবাদ!"

মহান চীনা জাতি এবং সোভিয়েট জাতির মধ্যেকার মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সাহায্য এবং গভীর শ্রদ্ধা জিন্দাবাদ !

চীনা জনগণের চমৎকার সন্তান এবং তাঁদের নেতা মাও সে তুঙ জিন্দাবাদ !

সমস্ত প্রগতিশীল মানবজাতির বন্ধু এবং নেতা, আমাদের গুরু স্টালিন জিন্দাবাদ !

—এ. ফাদেয়েভ

শান্তি চাই

ওরা আমাদের হত্যা করবে ?
ওরা আমাদের ধ্বংস করবে ?
ওরা আমাদের জরু গরু কেড়ে
সর্বস্বান্ত করবে ?
আমরা ওদের হত্যা করবো !
আমরা ওদের ধ্বংস করবো !
ওদের ঘরের বৌছেলেমেয়ে
আমাদের পায়ে ধরবে !

লক্ষ ঘরের প্রদীপ নিবিয়ে
মা বোনের মাথা চিবিয়ে চিবিয়ে
প্রেত পিশাচের উল্লাস নিয়ে
খুনের নেশায় নাচবো !
এই যদি চলে যুগ যুগ ধরে
মড়ার গাদায় শ্মশানে করবে
সর্বনাশের অকূল আঁধারে
কি নিয়ে আমরা বাঁচবো ?

ওপারে নাদির তখ্‌ত তাউসে
সুখে গদীয়ান শয়তান পুষে
উদয় অস্ত অবাধে চালায়
নিদারুণ নরহত্যা
এপারে অশোক খুনে জহ্লাদ
ঘন ঘন ছাড়ে সিংহ নিনাদ
সর্বহারার বস্তি জ্বালায়
ধনিকের নিরাপত্তা ।

দুই পারে দুই প্রহরী কুকুর
শৃঙ্খলে বাঁধা বিদেশী প্রভুর
নাদির অশোক সুখে ভরপুর
আজাদীর ঢোল বাজছে,
দুই কষ বেয়ে ঝরে পড়ে লালা
মুখে ঝুটা বুলি হাতে জপমালা
বুদ্ধের পাশে হজরৎ হাসে
নয়া গোলামীর রাজ্যে।

হিন্দুর দেব মন্দির থেকে
বলির রক্ত সারা গায়ে মেখে
ভগবান তাই জন্তুর মত
হিংস্র ধারালো দাঁতে,
মুসলমানের মুণ্ড চিবায়
শান্তির দীপ ফুঁ দিয়ে নিবায়
গ্রাম জনপদ রক্তে ভাসায়
কলুষ অস্ত্রাঘাতে।

মসজিদ থেকে ওঠে আল্লার
নৃশংসতম রণহুঙ্কার
সারা দেশ জুড়ে ছারখার করে
মানুষের বসবাস.
পিশাচের মত টুঁটি টিপে ধরে
হিন্দুকে ধরে কোরবানী করে
নরনারী বুকে ছুরিকা শানায়
কী করুণ পরিহাস!

ভগবানে আর আল্লায় মিলে
দাসখৎ লিখে যুগ্ম-দলিলে
উপনিবেশের শ্বেত প্রভুদের
মুক্তির ঘুষ খেয়ে,
হিন্দুস্থান পাকিস্তানের
বানিয়েছে পথ গোরস্থানের
পবিত্রতম ছলনার নীল
স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে।

সংহিতা আর শরিয়ৎ খুলে
পতিত গলিত সমাজের মূলে
তপ্ত গরল সিঞ্চন করে
ক্লাইভের যত গাধা,
রাজবল্লভ মীরজাফরের
বাঁদীর বাচ্ছা বংশধরের
হিন্দুস্থান পাকিস্তানের
এক সুরে সুর সাধা।

অশোক নাদির দু'ভায়ের বাপ
প্রভু ইংরেজ পলাশীর পাপ
সিন্দাবাদের কাঁধে চেপে বসা
দৈত্যের মত হাসছে।
চাষী মজুরের খুঁড়েছে কবর
খল খল খল হাসে বর্বর
সোনার বাংলা সর্বহারার
খুনের নদীতে ভাসছে।

চোর বাটপার বেইমান যত
যুদ্ধের ধুয়া তোলে অবিরত
আইনের চোখে ধুলো দিয়ে করে
বে-আইনী রণ সজ্জা,
প্রচারপত্রে ঝুটা সংবাদ
মানুষের মনে জাগায় বিষাদ
প্রতিহিংসার বিষাক্ত বিষে
বিষায় অস্থি মজ্জা।

হে আমার চির বঞ্চিত দেশ!
এ মহাপাপের কবে হবে শেষ
কতদিন আর হত্যা চালাবে
ক্ষ্যাপা কুত্তার মত।
যুগ যুগান্ত শাসনে শোষণে
ঘৃণার অনল জ্বলে কোটি মনে
উর্ধ্বমুখীন্ সে অনল শিখা
আজ কেন অবনত?

ছেলে মেয়ে বাপ মায়ের রক্তে
বৃদ্ধ তরুণ শিশুর রক্তে
অসহায় কোটি বাস্তহারার
করুণ অশ্রুজলে,
তোমাদের বুকে প্রচণ্ড ক্রোধ
জ্বলেও জ্বলেনি হয়ে নির্বোধ
ধর্মের নামে মাথা খোঁড়ো তাই
ধনিকের পদতলে।

দাঁড়াও এবার উন্নত শির
নব জাগরণে মহাপৃথিবীর
তুলে ধরো আজ রক্ত-নিশান
মুক্তির আহ্বানে,
যা'রা অসহায় নরনারী বুকে
ছুরিকা হেনেছে ক্রুর কৌতুকে
দু'পায়ে তাদের দলে পিষে দাও
শান্তির অভিযানে।

এপারে আমরা ওপারে তোমরা
লাথি মেরে ভাঙো ধর্মের কারা
স্বদেশী বিদেশী শয়তানদের
খাড়া হয়ে মুখোমুখী
দাঁড়াও এবার কোটি বাহু তুলে
সাম্যের মহা সমুদ্র কুলে,
উত্তরাকাশে জ্বল জ্বল করে
তারকা পঞ্চমুখী!

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

২৭শে নভেম্বরের স্মরনীয় রাত ঃ ১৯৪৯

(সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের ময়দানে উপস্থিত
লক্ষ জনতার যে আবেগ দেখেছিলাম—)

দেখোনা আকাল ছিঁড়ে উঠেছে হাজার হাতে।
আগুনের মশালগুলি। কখনো দেখিনি চোখে কখনো এমন রাতে
উঠিনি অনেক ঢেউয়ে তুলিনি ঝড়ের মতো নিজেরা নিজেকে তো কেউ।
এ বুঝি হঠাৎ ভাঙ্গে বাঁধেরি বদ্ধতাকে ছ'কুলি জলের ধারে ধুয়েছে হঠাৎ
যে ঢেউ।

তাই তো আজকে চোখে লাগছে আজকে অবাক
দৃষ্টি কেবল ভেজে ছোট কোন শিশুর মতো খুশীতে চোখের জলে
ছোট কোন শিশুর মতো লুকোন বাক্স থেকে কী যেন নিচ্ছি তুলে
কী যেন বিলিয়ে দেবো আজকে রাত্রি ছিঁড়ে আজ রাত্রি নিয়ে
ছ'হাতে ছড়িয়ে দেবো ছ'হাতে ঢাক্না খুলে ছ'হাতে মুঠোয় ভরে।
আহা সব শিশুর চোখের স্বপ্ন, আমার বুকের
স্বপ্ন, দেখোনা আকাশ ছেঁড়ে আজকে হাজার মশাল।

*

তোমাকে রাত্রি দেবো আকাশে লক্ষ তারায়,
ছড়িয়ে রাত্রি সেদিন আসবে গোপন সভায়।

তোমাকে রাত্রি দেবো মশালের হাজার কথায়।

—মুকুল ভট্টাচার্য

শান্তি ঝাণ্ডা

বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে দমবন্ধ অন্ধকার ঘর
যদি তুমি ঘৃণা করো,
যদি চাও আদিগন্ত মুক্তির আকাশ ভরা
সূর্যস্নাত আলোর প্রকাশ—
অথৈ মাঠের বুকে স্বর্ণ-রেণু ধানের আশ্বাস
তবে বন্ধু, হাতিয়ার তুলে নাও
শত্রুকে হটাও।

আমরা অযুত প্রাণ শান্তির নির্ভীক যোদ্ধা
এখন ইস্পাতী হাতে গ্রামে-মাঠে-বন্দরে তৈয়ার :
জল্পনার দিন শেষে নোতুন গানের সুরে এনেছি জোয়ার
অন্ধকার খনি-গর্ভে নির্মম প্রস্তুতি গড়ি
কলে ও খামারে লড়ি
শত্রুর যুদ্ধের ঘাঁটি নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করি
শানানো নখরে ছিঁড়ি মার্কিনী মুল্লুক জুড়ে এটমের হুংকার,
টুটি চেপে শেষ করি দস্যু বাঁটপাড়।
অধুনা আমার দেশে নারী-মাংস ছিঁড়ে খাওয়া
ছুধের বাচ্চাকে মারা
যত আছে ঘৃণ্য পশু বিদেশীর তাঁবেদার
তাদেরও বিরুদ্ধে বন্ধু, জারী করি নয়া ইস্তাহার।
শান্তির সৈনিক আমি :
আমি চাই মুক্ত বায়ু, আলো-প্রাণ খাদ্যের সম্ভার
শান্তির সুখের নীড়, ভুঁখা-নাংগা মানুষের সমগ্র সত্তার
পূর্ণাংগ একটি রূপ—
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বাল-বাচ্চা, নিরাপত্তা পৃথিবী প্রিয়ার!
আজ তাই যুদ্ধের রক্তাক্ত পথ বাতিল—বাতিল
শান্তির শিবিরে আমি হোলাম সামিল।

সর্বনাশা তোমাদের বিকিকিনি খেলার আসরে
মানুষ সামান্য পণ্য ?
হায়রে মানুষ !
শ্রম যার বিশ্বকর্মা; সভ্যতার স্পর্শমণি হাত,
প্রেম যার কাব্যের উচ্ছল উৎস,
যার সুখদুঃখ হাসিকান্না যার পৃথিবীর দিনরাত্রি
সূর্য ওঠা সূর্য অস্ত যাওয়া,
আজ সে উন্মাদ অন্ধ আত্মঘাতী ক্রোধের ছুরিতে
আজ সে মানুষ আত্মনিগ্রহের পাথরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে
নিজেকে রক্তাক্ত করছে,
ফেটে পড়ছে বারবার হাহাকার কান্নায় হাসিতে।
সে আজ শিকার আর
মুনাফাশিকারী,
জিপে ট্রাকে তোমাদের টহলদারী বেয়নেট শান্তির রক্ষক।

অর্ধেক জীবন যার
কেটেছে শীতলপাটি-বিছানো দাওয়ায়
এখনো হাওয়ায়
গঙ্গায় পদ্মায় যার ভাটিয়ালি সুরের উজান,
বাকি অর্ধেক জীবনে তার
কেন কেন বারবার বৈশাখীর দম্‌কা বাতাস কেন
ওড়াও ছড়াও সুখ তার
স্বপ্ন তার
সাধের সংসার তার সাজানো বাগান ? কেন ?
কী আশা, কী ভাষা তার
কী মন-কেমন-করা দিন
হারানো দিনের চিন্তা বুকে যার অনির্বাণ
হায় দেশান্তরী।

চোখে যার অনির্বাণ ফেলে-চ'লে-আসা পূর্ব-পুরুষের ভিটের আগুন
যে মানুষ আজ শুধু অনন্ত জিজ্ঞাসা,
আজ
দিশাহীন হতাশার অন্ধকারে হাত তার
খোঁজে অন্য হাত।
বিলাপের পরপার থেকে অশ্রুসাগরের ঢেউ ঠেলে ঠেলে
অদৃশ্য সে হাত ছোঁয় মা'র রিক্ত বিক্ষত হৃদয়
বলে 'মা এইত আমি',
যেদিকে দু'চোখ যায় যাওয়ার এ অন্ধ দিকচিহ্নহীন পথে
হাতে হাতে গুঁজে দেয় এক টুকরো ইস্তাহার :
'অকূল পাথারে ডাঙ' জেগে উঠি আমি, আমি হাজং মৈমনসিংহ
নতুন পৃথিবী'।
শান্তি কি অক্ষুণ্ণ থাকবে ?......
গুমোট রাস্তার মোড়ে মোড়ে
আশার দিগন্তে শুধু আসন্ন ভরে আগে চমকে যায় একটি দু'টি
পোস্টারের বিদ্যুৎ নিশানা......
শান্তি কি অক্ষুণ্ণ থাকবে ?

শান্তি কি অক্ষুণ্ণ থাকবে চিরকাল তোমাদের শ্মশানে, শকুন ?

শত্রু ভাখো, ক্রীতদাস বিশ্বাসঘাতক ভাখো,
এ শ্মশানে, ঐকতান কান্নার আসরে
রক্তারক্তি লুটপাট বীভৎস আগুন পার হ'য়ে
মৃত্যুর মিছিল থেকে,
স্বজনসন্ততিহারা যে-মানুষ ঘরপোড়া ভস্মঅবশেষ ব'সে আছে,
শূন্যদৃষ্টি থেকে তার,
চোখের স্ফুলিঙ্গ থেকে পুত্রহীনা উন্মাদিনী মা'র
কান্নাকে বিদীর্ণ ক'রে

এই মুহূর্তেই
একে একে উঠে আসছে অদৃশ্য সে হাত,
একে একে উঠে আসছে হাতুড়ির হাত, আসছে ক্রোধের হাপর-জ্বালা
বিশ্বকর্মা হাত
একে একে উঠে আসছে বাঁকানো কাস্তের হাত মুঠো মুঠো গান নিয়ে
পৃথিবীর দিনরাত্রি নিয়ে
একে একে উঠে আসছে ঘৃণায় সমুদ্রে ঢেউ সেই হাত তোমাদের দিকে।
শত্রু, তুমি বিশ্বাসঘাতক,
আতঙ্কে থরথর কাঁপো, চোখ বোঁজো : আসছে মোহমুক্তির সেদিন
তোমাদের শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।

আর তার আগে প্রতিদিন,
আজ থেকে প্রতিরাত্রে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিলে পর
বুকে বিঁধবে তোমাদের অপহৃতা ধর্ষিতা নারীর
বোবা বুকফাটা চিৎকার,
আজ থেকে প্রতিদিন নিজের ছেলের মুখে চেয়ে
শিউরে উঠবে, দেখবে সে যে লক্ষ লক্ষ ছন্নছাড়া অনাথ শিশুর
একটি মর্মান্তিক মুখ,
আজ থেকে তোমাদের অন্ন রুচবে না মুখে,
চোখেও থাকবে না ঘুম,
আজ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই পাবে মৃত্যুর কঙ্কালস্পর্শ,
প্রতি মুহূর্তেই
ধ্বংসের গর্জন হ'য়ে প্রলয়ের অন্ধকার সমুদ্রকল্লোল হ'য়ে
তোমাদের কানে বাজবে আমার এ কণ্ঠস্বর, গান।

—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা"

মার্কস্‌বাদী সাহিত্যিকগণের চেতনা হইতে সংস্কারবাদের মোহ উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে 'পরিচয়'-কে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্র গুপ্ত যে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রগতিশীল সংস্কৃতিবিদ মাত্রেই কৃতজ্ঞতা বোধ করিবেন। সাহিত্যের ও বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিচারে কি ভাবে মার্কস্‌বাদকে প্রয়োগ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে—এই প্রশ্ন কিছুকাল ধরিয়া মার্কস্‌বাদী সাহিত্যিকগণকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা করিলে ইহার মীমাংসা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিবে। কিন্তু অসুবিধা হইতেছে এই যে, রবীন্দ্র গুপ্ত এই একটি প্রবন্ধে সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজ-বিপ্লব সম্বন্ধে এতগুলি আলোচনা-সাপেক্ষ উক্তি ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন যে, একটি প্রবন্ধে তাহাদের প্রত্যেকের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তাই আমি বাছিয়া লইব মাত্র কয়েকটি উক্তি যেখানে আমি বিশেষ বাধা পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস, সেইগুলি গ্রহণে আমার বাধা দূর হইলে অন্যগুলিতে অসুবিধা হইবে না।

(ক) ভারতে ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে মার্কস্‌-এর অভিমত

রবীন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন :

"ভারতের ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তা প্রগতিশীল ধারা নয়; বরং তার উল্টো ধারা। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ-শাসন প্রগতির সূত্রপাত করেছিল—একথা যদি সত্য হয়, তবেই এদের ধারাকে প্রগতিশীল বলা যায়।···কিন্তু মার্কস কখনও একথা বলেন নি যে ভারতে ইংরেজ-শাসন একটি প্রগতিশীল শক্তি।"

এই উক্তি গ্রহণে আমার বাধা আছে। আমার ধারণা, এ উক্তিতে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসের সিদ্ধান্তকে আংশিকভাবে প্রতিফলিত করা হইয়াছে, সম্পূর্ণভাবে নয়। সেইজন্য মার্কস ১৮৫৩ সালে এই বিষয়ে যে দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—যাহা এখনও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত—তাহাদের পুনরায় সম্পূর্ণভাবে স্মরণ করা আবশ্যক।

ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কস বলিতেছেন যে, মোগল সম্রাট, মোগল সুবেদার, মারাঠা ও আফগান-শক্তির

পরস্পর-বিরোধীতার ফলে শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, জন্মগত-জাতিগুলিরও (Castes) পরস্পর-বিরোধিতার ফলে, তখনকার ভারতীয় সমাজ এমনই শতধা-বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে বিজিত না হইয়া তাহার অন্যরূপ ভাগ্য সম্ভব ছিল না। [Such a country and such a society, were they not the pre-destined prey of conquest ?...India then could not escape the fate of seing conquered.") তাই মার্কস্-এর মতে, প্রশ্ন এই নয় যে, ভারতকে জয় করার ন্যায্য অধিকার ইংরেজের ছিল কি না। প্রশ্ন এই যে, ইংরেজের বদলে যদি অন্য কোনো জাতি—যথা, তুরস্ক, পারস্য অথবা রুশিয়া—ভারত জয় করিত, তাহা আমরা পছন্দ করিতাম কি না। মার্কস বলেন, না—তাহা আমরা করিতাম না। মোগল প্রভৃতি অন্য জাতিরা পূর্বে ভারত জয় করিলেও তাহারা বিজিত ভারতীয়দের উন্নততর সভ্যতার দ্বারা নিজেরাই বিজিত হয়, কিন্তু ইংরেজ শাসকেরাই প্রথম ভারতে আনিল উন্নততর সভ্যতা, যা ভারতীয় সভ্যতার নাগালের বাহিরে ছিল। ইংরেজ আসিয়া ভারতে বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত অর্ধ-অসভ্য অর্ধ-সভ্য গ্রাম্য গোষ্ঠীজীবনকে শিথিল ও তাহার আর্থিক ভিত্তিকে চূর্ণ করিয়া দিল। ইহার ফলে যাহা ঘটিল তাহাকে মার্কস্ বলিতেছেন, "এশিয়ার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, এমন কি সত্য কথা বলিতে গেলে, **একমাত্র সামাজিক** বিপ্লব।" (বড় হরফ মার্কস্-এর)। ["......dissolved these small semi-barbarian semi-civilised communities by blowing up their economical basis and thus produced the greatest, and to speak the truth, the *only social* revolution ever heard of in Asia."]

ইহা হইতে কি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না যে মার্কসের মতে ইংরেজের ভারত-বিজয় কেবল একদেশ কর্তৃক অন্য দেশ বিজিত হওয়ার মতো নিছক রাজনৈতিক ঘটনা নয়, ইহার তাৎপর্য ব্যাপকতর ও গভীরতর? তাই তিনি ইহাকে **এশিয়ার একমাত্র সামাজিক বিপ্লব** আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধনে ইংরেজ শাসকবর্গের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কত নীচ ছিল ও তাহারা কি ভীষণ পাশবিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা মার্কস-এর দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু তবুও তিনি বলিতেছেন, ইহাই আসল প্রশ্ন নয়। তাঁহার মতে আসল প্রশ্ন এই যে, এশিয়ার সামাজিক জীবনে আমূল বিপ্লব না ঘটিলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়তি সফল হওয়া সম্ভব কি-না। তাহা যদি না হয়, তাহা

হইলে স্বীকার করিতে হয় যে ইংলণ্ড যত পাপই করুক না কেন, সে এই বিপ্লব ঘটাইয়া নিজের অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। ["England, it is true, in causing a social revolution in Hindustan was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the sacial state of Asia ? If not, whatever may have been the crime of England, she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution."] ইহার পরে কি করিয়া বলা চলে যে, মার্কস্ কখনও বলেন নাই যে ভারতে ইংরেজ-শাসন একটি প্রগতিশীল শক্তি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, মার্কসবাদের শিক্ষা যে, ইতিহাসে প্রগতির ধারা কখনও একটি রেখা বাহিয়া অগ্রসর হয় না, তাহার গতি দ্বান্দ্বিক, পুরাতন ও নূতনের অন্তর্বিরোধের ভিতর দিয়াই তাহার আত্মপ্রকাশ ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কস তাই স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন—ভারতে ইংলণ্ডের করণীয় কাজ দ্বিবিধ। একটি ধ্বংসাত্মক, অন্যটি নবসৃজনশীল; একটি প্রাচীন এশিয়াব্যাপী সমাজ-ব্যবস্থার একান্ত উচ্ছেদ; অন্যটি এশিয়াতে পাশ্চাত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন। ["England has to fulfil a double mission in India : one destructive and the other re-generating : the annihilation of old Asiatic society and the laying of the material foundation of western society in Asia."]

ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসশীলতা সত্ত্বেও কোনগুলিকে মার্কস ভারতে নবজীবনের লক্ষণ মনে করিতেন তাহাও তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন:

(১) ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য—বিখ্যাত মোগলদের আমলে যে ঐক্য হইয়াছিল তাহার চেয়েও বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর—ইহা হইতেছে ভারতের নব-জীবনের প্রথম শর্ত। এই ঐক্য ভারতের উপর চাপাইয়া দিয়াছে ইংরাজের তরবারি, কিন্তু এখন ইহাকে শক্ত ও স্থায়ী করিবে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ। (২) ভারতীয় সেনাবাহিনী ইংরেজ ড্রিল-সার্জেণ্টের অধীনে শিক্ষিত ও সংগঠিত হইয়া ভারতীয় আত্মমুক্তির অপরিহার্য অঙ্গ হইবে। (৩) স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র—ভারতীয় ও ইংরেজের যৌথ-পরিচালনায় এশিয়ার সমাজে প্রথম প্রবর্তিত হইয়া

ভারতের পুনর্গঠনে হইবে নূতন ও শক্তিশালী হাতিয়ার। (৪) ভারতের অধিবাসীগণের ভিতর হইতে কলিকাতায় ইংরেজের তত্ত্বাবধানে, অনিচ্ছায় ও কৃপণভাবে শিক্ষিত হইয়া উদ্ভূত হইতেছে **একটি নূতন শ্রেণী** যাহারা ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশশাসনের উপযুক্ত শক্তি অর্জন করিতেছে। ["From the India natives, reluctantly and sparingly educated at Calcutta under English superintendence, *a fresh Class* is springing, endowed with the requirements of Government and imbued with European science."] (বড় হরফ আমার)

বলা বাহুল্য, এই শেষ লক্ষণটি একান্ত প্রযোজ্য কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম রামমোহন ও হিন্দুকলেজের বিস্ময়কর প্রতিভাশালী তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওর অনুবর্তীগণের পক্ষে। তাই ভারতের নবজীবন সৃজনে রামমোহন ও ডিরোজিওর প্রভাব প্রগতিশীল নয়, প্রতিক্রিয়াশীল—এই মন্তব্য মার্কসবাদ-সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা পাইতে হয়।

ইংরেজ-শাসনের এই নবসৃজনশীল সুফল সত্ত্বেও ইহাতে যে, ভারতীয়গণের দুঃখদুর্দশার অবসান হইবে না, যতদিন না ভারত ইংরাজের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হয়,—ইহাও মার্কসের জানা ছিল না। তিনি জানিতেন, ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ভারতের উৎপাদন শক্তি বাড়াইয়া দিলেও তাহার ফলোপভোগে ভারতবাসীকে বঞ্চিত রাখিবে। ইহাই ধনবাদের ধর্ম। তবুও ব্রিটিশ বুর্জোয়া ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পথ সুগম না করিয়া পারিবে না। ধনবাদের নিকট ইহার চেয়ে বেশী কিছু প্রত্যাশা করিলেই ভুল হইবে।

ভারতে বুর্জোয়া আদর্শে অনুপ্রাণিত রামমোহনপ্রমুখ চিন্তানায়কগণের বিরুদ্ধে আজ যে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহার আসল উৎস এইখানে। ইহা নিশ্চিত ভারতে ব্রিটিশ-শাসনকে মার্কস যে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখিয়াছিলেন, রামমোহন তাহা পারেন নাই। মার্কস্-এর প্রতিভা রামমোহনের ছিল না এবং রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে—মার্কসবাদের প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" প্রকাশের বছর পনের পূর্বে। একথা ঠিক যে, রামমোহন ভারতে ইংরেজ শাসনের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, তাঁহার মনে বা তাঁহার পরিচালিত আন্দোলনের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বা পরাধীনতার গ্লানি ছিল না। তাঁহার অক্ষমতা এই যে, বুর্জোয়া সভ্যতার প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহার অসম্পূর্ণতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—যেমন পারিয়াছিলেন

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতারা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি মার্কস-এঙ্গেলস্-এর পূর্বে অন্য কাহারও নিকট আশা করা অযৌক্তিক। তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষমতা এই যে ইংরেজের দু'টি রূপ—নিজের দেশে প্রগতিশীল ইংরেজ ও পরাধীন দেশে শাসকরূপে ইংরেজ—ইহাদের পার্থক্য তিনি ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার দুরাশা ছিল এই যে, ইংরেজ যেমন তাহার নিজের দেশে ক্রমশ বিস্তৃততর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবা চলিয়াছে, ভারতেও তাহারা অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া ভারতকে উন্নত করিয়া তুলিবে, ইংরেজের শিক্ষায় ভারত স্বাধীন হইবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্যই ইংরেজীর মারফত গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ভারতবাসীর বহুদিন ধরিয়া পাওয়া দরকার। আজ এ দৃষ্টিভঙ্গীকে সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল বলিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না—১৮৫৩ সালে মার্কস-এরও এই ধারণা ছিল যে, ভারতে ইংরেজ-শাসন স্বল্পকাল-স্থায়ী ব্যাপার নয়, তাহার উচ্ছেদের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হইবে। কি ভাবে ভারত স্বাধীন হইতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মার্কস লিখিতেছেন যে, ব্রিটিশ বুর্জোয়া ভারতীয় সমাজের নানা অংশে যে-নূতন উপকরণ আনিয়া দিল, তাহার সুফল ভারতীয়েরা ততদিন উপভোগ করিতে পাইবে না যতদিন না ইংলণ্ডের তখনকার বুর্জোয়া শাসকেরা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা উৎপাটিত হইবে; কিংবা যতদিন না ভারতীয়েরা এতো শক্তিশালী হইয়া উঠিবে যে তাহারা নিজের শক্তিতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিতে পারিবে। তিনি বলিতেছেন—ভারতের নব-জাগরণ ঘটিবেই, যদিও তাহার জন্য **কমবেশী দীর্ঘ** সময় লাগিবে। ["The Indians will not reap the fruits of the new elements of society scattered among them by the British Bourgeoisie, till in Great Britain itself the now ruling classes shall have been supplanted by the industrial proletariat, or till the Hindus themselves shall have grown strong enough to throw off the English yoke altogether. At all events we may safely expect to see *at a more or less remote period* the regeneration of that great and interesting country."]। (বড় হরফ আমার)

দেখা যাইতেছে যে, মার্কস-এর অলৌকিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এখানেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ইংলণ্ডে লেবর পার্টি শাসক-শ্রেণীতে উন্নীত হইলেও যে সামাজিক বিপ্লব মার্কস-এর ধ্যান-দৃষ্টির গোচর ছিল, তাহা সাধিত হয় নাই। ভারতের সমাজ-বিপ্লবও এখনও স্থগিত হইয়া আছে।

মার্কসবাদের সূত্রানুসারে যে-শক্তি ভারতে ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটাইতে পারিবে, তাহা হইতেছে ভারতের নবজাগ্রত শ্রমিক-শ্রেণী, অবশ্য কৃষক ও মধ্যবিত্তের সহযোগিতায়। সেই শ্রমিক-শ্রেণী এখনও ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রেণী-সচেতন ও সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই যে "স্বাধীনতা" ভারতে চালু করা হইয়াছে, তাহা মার্কসবাদী স্বাধীনতা নহে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এখনও অসমাপ্ত।

কিন্তু ইংরেজ যখন ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করিল অবাধ বাণিজ্য ও অবারিত লুণ্ঠনের তাগিদে ভারতের ভূমিতে রেলগাড়ীর লাইন পাতিতে বসিল তখনই, মার্কস বলিতেছেন, সে বাস্তব ব্যবস্থা করিয়া দিল ভারতে নূতন শক্তি উদ্ভবের। ইংরেজ আমলে ভারতে যে নূতন শ্রমশিল্পের প্রবর্তন হইল—যাহার গর্ভে প্রসূত হইবে ভারতীয় বুর্জোয়া ও ভারতীয় প্রলিটারিয়েট—রেলগাড়ী হইতেছে তাহার অগ্রদূত। এই বিরাট দেশে নানাদিকে রেলগাড়ী চালাইতে গেলে শুধু রেল চালাইবার জন্য প্রয়োজন যে শ্রমশিল্প, কেবল তাহারই ব্যবস্থা করিলে চলে না, পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রমশিল্পেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্থাৎ ভারতের সনাতন সামন্তবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া ধনবাদী শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করিতে হয়। হইলও তাহাই। ভারতের শ্রমশিল্পের সবটাই ইংরেজের করায়ত্ত রহিল না, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় বুর্জোয়ারও সৃষ্টি হইল। ইহাদের নেতৃত্বে ১৯১৯-২২ সালে ভারতে যে প্রচণ্ড, গণবিক্ষোভ পরিচালিত হয়, ১৯২৮ সালে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ বিশ্ব-কংগ্রেসের রিপোর্টে তাহা "প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন" ["This first great anti-imperialist movement in India (1919-1922)"] বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মানুসারে বুর্জোয়ার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণীও জন্ম নিতে বাধ্য। বুর্জোয়া বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিকাশ হয়, যদিও উভয়ের গতিবেগ একই মাত্রা মানিয়া চলে না। প্রথমে বুর্জোয়ারা হয় শক্তিমান, শ্রমিকের শক্তি আসে পরে। ভারতীয় বুর্জোয়ার জন্মকাল মোটামুটি ধরা হইয়া থাকে ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে, যদিও তাহার প্রথম প্রকৃত উদয় ১৮৭৫ সালে। আর ভারতীয় শ্রমিকের শক্তির প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ বিশ শতকের প্রথম দশকে। যে সামাজিক শক্তিপুঞ্জ অবশেষে ইংরেজ শাসনের অভিশাপ হইতে ভারতবাসীকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে সমর্থ, তাহার স্বরূপ বুঝিতে এই সুবিদিত সময়-নির্ঘণ্ট মনে রাখা দরকার।

(খ) সিপাহী-বিদ্রোহের শ্রেণী-চরিত্র

এই মার্কস-এর নিরিখে ইংরেজ-শাসিত ভারতে সমাজ-বিপ্লব ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেণী-বিশ্লেষণ ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার করা যায়। ইংরেজ ভারতে লইয়া আসিল সুধা ও বিষ, সামাজিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক দাসত্ব—এই তাহার দ্বৈতরূপ। পরাধীনতা বাদ দিয়া যদি ভারতের সামন্তবাদের অচলায়তন ধ্বংসের জন্য তাহারই ভিতর হইতে ইংলণ্ডের প্রভাবে বুর্জোয়া ধনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, যেমন হইয়াছিল ইওরোপের নানা দেশে, তাহা হইলে ভারতে সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাসের ধারা হইত অন্যরূপ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ধর্মান্দোলন অনড় সামন্তবাদের অভ্যন্তরে যে গতিবেগের সঞ্চার করিতেছিল, তাহার স্পন্দন ছিল অতি মৃদু, কারণ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোনো স্তরে তাহার ভিত্তি গাঁথা ছিল না। তাহা হইতে স্বতঃ-উৎসারিত ভাবে কোনো ভবিষ্যৎ যুগে ধনবাদের উদ্ভব হইতে পারিত কি-না, ইহা এখন পুঁথিগত গবেষণার বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কারণ ইতিহাস এই মন্থরগতি বিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে নাই। পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ইংরেজ ভারতে তথা এশিয়ায় ধনবাদের বুনিয়াদ রচনার প্রথম প্রস্তর স্থাপিত করিল, ভারতে ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত হইল, যাহাতে ভারত তাহার পূর্বতন অতীত ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ["..... seperates Hindusthan, ruled by Britain from all its ancient traditions and from the whole of her past history."]

কিন্তু পরাধীন দেশে সমাজ-বিপ্লব অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না—পরাধীনতার শৃংখলই তাহার মস্ত বাধা। ধনবাদের প্রকৃত ধর্ম সামন্তবাদের উচ্ছেদ। কিন্তু এমন কি স্বাধীন দেশেও ধনবাদী শাসকেরা এ ধর্ম পূর্ণ পালন করে না। অর্ধেক পথ অগ্রসর হইয়াই সামন্তবাদের সহিত আপস করে নিবিত্তশ্রেণীর অগ্রগমনে ভীত হইয়া। এই প্রবৃত্তি ঔপনিবেশিক দেশে আরও প্রবল হইবার কথা। ভারতের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। ধনবাদী ইংরেজ পরাধীন ভারতে সামন্তবাদকে পরাভূত করিয়াও উচ্ছেদ করিল না, পদানত করিয়া রাখিল। এবং তাহার প্রভাবে শ্রমশিল্পের উদ্ভব বিলম্বিত ও প্রসার রহিত করিয়া রাখিল আপন স্বার্থের সংরক্ষণে। যে-নির্জীব সামন্তবাদকে,

দেশীয় নবাব-রাজা-মহারাজাগণকে জীয়াইয়া রাখা হইল, তাহারাই হইল—মার্কসের মতে—ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রধান স্তম্ভ, যদিও ইহাদের হতমান করিয়াই ইংরেজ ভারতে রাজ্যাধিকার পাইয়াছিল। এই স্তম্ভগুলিকে উৎপাটিত করিতে না পারিলে ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটানো অসম্ভব।

তাই ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামেরও দুইটি রূপ, দুইটি ধারা এবং দুটি ধারাই বিপ্লবী। একটি ধারা—প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সিরাজের চেষ্টা সফল হইলে এই ধারার প্রয়োজন থাকিত না। তাই ইংরেজের বিরুদ্ধে সিরাজের সাময়িক সাফল্য মার্কস-এর চোখে মহীয়ান। এই ধারার শেষ অধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহ। নীল, সন্ন্যাসী, সাঁওতাল, ওয়াহাবি প্রভৃতি আন্দোলনের কোনটিই বিক্ষোভের অতিরিক্ত বিদ্রোহের পর্যায়ে উঠিতে পারে না, সিপাহী-বিদ্রোহের সহিত তুলিত হইতে পারে না। সিপাহী-বিদ্রোহ ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে শেষ সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহার গৌরবময় ভূমিকা কোনো মার্কসবাদী সাহিত্যিক কোনদিন অস্বীকার করা দূরে থাকুক, কখনও অশ্রদ্ধা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তাঁহারা জানেন—মার্কসের মতে—এখানেও আসল প্রশ্ন এই নয় যে, বিদ্রোহের নেতৃত্ব কাহার হাতে ছিল। মূল কথা এই যে, ভারতীয় জনগণের একাংশ হিন্দু-মুসলমান সৈনিক ও কৃষক, বিদেশীর শোষণে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া লড়িয়াছিল বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য। তাহাদের বীরত্বের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। এই জন্যই মার্কস ইহাকে "বিরাট জাতীয় বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'জাতীয়' কথাটি স্টালিন-নির্দিষ্ট অর্থে প্রযোজ্য নহে, কারণ, স্টালিন দেখাইয়াছেন, আধুনিক ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পূর্বে কোনো দেশে আধুনিক 'জাতি' গড়িয়া উঠিতে পারে না। বৃহৎ জনগোষ্ঠীগুলি—'পিপল্‌স্'—জাতি অথবা 'নেশন'-এ পরিণত হয় ধনতন্ত্রের বিকাশের তাড়নায়। তবুও মার্কস ইহাকে 'জাতীয়' বলিয়াছেন এই জন্য নয় যে, ইহাতে ভারতের সমগ্র জনসাধারণ—এমন কি তাহার বহুলাংশও যোগ দিয়াছিল। 'জাতীয়' এই জন্য যে, ইহাতে ভারতীয় সমাজের দুইটি বিরোধী অঙ্গ—হিন্দু ও মুসলমান ও তখনকার সমাজের সবচেয়ে শোষিত অংশ—কৃষক ও সৈনিক—মিলিত হইয়া রাজ্যলোলুপ বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিল

কিন্তু 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড'-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কোথাও খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না যে, মার্কস ইহাকে "কৃষক-বুর্জোয়া" বিপ্লব, বা "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রথম ধাপ বলিয়াছেন। বস্তুত "কৃষক-বুর্জোয়া"—এই কথাটি নূতন রচনা বলিয়া আমার বিশ্বাস অন্তত সুপ্রচলিত নহে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইহাকে অকস্মাৎ প্রয়োগের পূর্বে ইহার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। আর পূর্বে উল্লিখিত সময় নির্ঘণ্ট মনে রাখিলে কি করিয়া সিপাহী-বিদ্রোহকে "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" বিপ্লব বলা যায়? "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" শব্দটি মার্কসীয় সাহিত্যে সুপরিচিত, তাহার অর্থ নেহাৎ অস্পষ্ট নয়। যে বিদ্রোহে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় না, তাহাকে বুর্জোয়া-বিপ্লবের অন্তর্গত ভাবিতে পারা খুবই কঠিন। ১৮৫৭ সালে ভারতে বুর্জোয়া তথা প্রলেটারিয়েটের জন্ম হইয়াছিল, এ কথা ইতিহাসে লেখে না। স্বাধীকারচ্যুত ফিউডাল সামন্তগণের একাংশ ও দিল্লী-মীরাট-কাণপুর-লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের কৃষক-সৈনিক, ইহাদের সম্মেলনে এই বিদ্রোহ। বাংলা দেশে এই বিদ্রোহের সূচনা হইলে বাংলার কৃষক ইহার সমর্থনে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্ষুব্ধ হয় নাই। মার্কস বিদ্রোহ-পরায়ণ কৃষক-সৈনিকশ্রেণীর বীরত্বের গুণগান করিয়া তাঁহার লেখনীর সমস্ত বিষ ঢালিয়া দিয়াছেন ফিউডাল সামন্তবর্গের বিরুদ্ধে, যাহারা জনসাধারণের বিক্ষোভের বিরোধিতা করিয়া বিদেশী শাসক ইংরেজের সহায়তা করিয়াছিল।

কিন্তু ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর বিপ্লবী শক্তি—যে শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ ফিউডালবাদের উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, যে শক্তি ছিল বিপ্লবী বুর্জোয়া ভাবধারার বাহক—তাহাকে বিচার করিয়া মার্কস "প্রতিক্রিয়াশীল" আখ্যা দিয়াছিলেন, এমন কথা 'সোভিয়েট ল্যাণ্ডের' উক্ত প্রবন্ধে দেখা যায় না। বুর্জোয়া শ্রেণী পরিণামে যতোই প্রতিক্রিয়াশীল হউক না কেন, প্রথম যুগে তাহাদের ভূমিকা থাকে প্রগতিশীল—'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র প্রকাশের সময় হইতে এই তথ্য মার্কসবাদীদের সুপরিচিত। রামমোহন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ছিলেন এই বিপ্লবী ধারার সঞ্চালক। তাঁহারাই সুগম করিতেছিলেন ভারতে স্বাধীন চিন্তার পথ, সূচনা করিতেছিলেন প্রাচীন ভূমিব্যবস্থার বিলোপে শ্রমশিল্পের প্রবর্তনের অনুকূল পরিবেশ। বুর্জোয়া ব্যবস্থা এদেশে স্বাধীনভাবে না আসায় এই বিপ্লবী ধারাও শীর্ণকায় ও অপরিস্ফুট হইতে বাধ্য—ইওরোপীয় বিপ্লবের তুলনায়। তবু তাহাদের একই গোত্র। তাই, বিশ্বপ্রসারী বুর্জোয়া সভ্যতার বিচিত্র প্রকাশে রামমোহনের এত খরদৃষ্টি।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তুলনায় এইরূপ বিপ্লবী ধারায় হাতে হাতে ফল পাইবার আশা করা যায় না বটে, তবে এই খাতেই বহিয়া গিয়াছে ইতিহাসের মূল ধারা। সিপাহী বিদ্রোহে কৃষক-সৈনিকের বীরত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে তাহার ব্যর্থ পরিণামও ছিল অবধারিত। বুর্জোয়া ও তৎপ্রসূত গণশক্তির আবির্ভাবের পূর্বে ইংরেজ অধিকারকে উৎপাটিত করার ক্ষমতা ভারতে ছিল না। সিপাহী-বিদ্রোহের সুযোগে ভারত আমেরিকা হইতে পারিল না, ইহাতে হুতোম বিক্ষুব্ধ হইয়া বাঙালী বাবুদের বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু মার্কস ঠিকই বলিয়াছিলেন, ভারত হইতেছে "এশিয়ার আয়র্লণ্ড," আমেরিকা নহে। আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের করচ্যুত হয় (১৭৭৬ সাল) সে ইংলণ্ড ও ১৮৫৭ সালের অপ্রতিহত বলশালী ইংলণ্ড একই পদার্থ নহে। আর ভারতের মতো আয়র্লণ্ডেও বুর্জোয়া-শক্তির উদ্ভব না হওয়ায় ওদেশ আজিও রাজনৈতিক ভাবে বাহ্যত স্বাধীন হইলেও অর্থনৈতিক ভাবে কার্যতঃ বৃটিশ ধনবাদের তাঁবেদার।

সিপাহী বিদ্রোহ যখন সংঘটিত হয়, তখন মার্কস যেগুলিকে বলিয়াছেন ভারতে ইংরেজ শাসনের নবসৃজনশীল শক্তি, সেগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৪৯ সালে জোর করিয়া পাঞ্জাব দখলের পর বলা যাইতে পারে—আসমুদ্রহিমাচল সমুদয় ভারতবর্ষ ইংরেজের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ। রেল ও টেলিগ্রাফের জাল দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। দেশীয় সৈন্যবাহিনী তাহাদের উপর হৃদয়হীন অত্যাচার সত্ত্বেও ব্রিটিশ শৃংখলে আবদ্ধ—যাহার ফলে সিপাহী-বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল অতি সংকীর্ণ গণ্ডীতে। ভারতে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে, যাহার মহিমায় 'হুতোম'-ও স্বীকার করেন যে তিনি মুখ খুলিয়া কথা কহিতে পারেন। আর প্রস্তুত হইয়াছে একটি নূতন শ্রেণী—ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে দীক্ষিত ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়। সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালেও ভারতীয় ইংরেজ শাসকের মধ্যে অনেকে এই শ্রেণীকে ইংরেজ শাসনের বৃহত্তর অন্তরায় মনে করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এম্, আর, গাবিন্‌স্ (M. R. Gubbins) প্রণীত An Account of the Mutinies in Oudh নামক গ্রন্থে। বইটির তৃতীয় সংস্করণ লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। গাবিন্‌স্ বলেন—"আমার বিবেচনায় ভারতে আমাদের রাজত্ব করার পথে, অযথা পিছাইয়া যাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী ভয় করার আছে ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যধিক অগ্রসর হওয়াতেই।" ["I

think that our rule in India has more to fear from future excessive innovation in matters of education etc. than from any improper retrogration."] ইংরেজী শিক্ষাই তাহাদের চিত্তে জাগাইয়া দিতেছিল গভীর স্বদেশপ্রীতি ; প্রমাণ—ডিরোজিও'র বিখ্যাত ইংরেজী কবিতা "ভারতমাতার প্রতি"। ইহারা ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে অধিকার স্থাপনে অতিমাত্রায় ব্যগ্র কেবল কতকগুলি বড়ো চাকুরী পাইবার মোহে নহে ; ফরাসী বিপ্লবের মূল শিক্ষার অন্যতম—যাহার প্রতিভা আছে তাহার পথ খুলিয়া রাখিতে হইবে—তাহাদের জীবনমন্ত্র। এই মানবিক অধিকারের দাবিতে তাহারা ভারতের শাসনযন্ত্রে ভারতবাসীর অনধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিল। তাহারা ছিল তখনকার দিনের বস্তুবাদী—মিল, বেন্থাম, কোঁৎ মায় অ্যাডাম স্মিথ তাহাদের আচার্য স্থানীয়। তাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে এক ধর্ম হইতে অন্য ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নয়, ভারতের পুঞ্জীভূত স্থিতিশীলতাকে সবেগে আঘাত করার জন্য। হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন তখন তাহাদের মনে জাগে নাই, কারণ তখন সে প্রশ্নই ছিল নিরর্থক ; তখন দুইটি মাত্র বিরোধী শক্তি—ভারতীয় ও ইংরেজ। দেশের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাহারা খড়্গহস্ত, দেশের দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিতে বেদনার্ত, তাই তাদের সমর্থন ধর্মাধর্ম-নির্বিশেষে শোষিত কৃষকের পক্ষে, অশুচি চণ্ডালের পক্ষে। আচারে-বিচারে, কর্মে-বিশ্বাসে, পুরাতনকে পরিত্যাগ ও নূতনকে গ্রহণ মার্কসীয় বিজ্ঞানসম্মত প্রগতির এই চিরন্তন উৎস হইতে বাংলাদেশে তথা ভারতে বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রথম উদ্ভব। ঔপনিবেশিক পরিবেশে এই উৎস স্বভাবতই স্বল্পপ্রাণ, তথাপি ইহার ছিল গুণগত উৎকর্ষ, ভবিষ্যতে প্রসারিত হইবার অমোঘ নিয়তি। এবং ইহারই শিল্পগত প্রকাশ, বাংলাদেশের বুর্জোয়া সাহিত্য। তাই, যতই তাহার অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তাহাকে প্রগতিশীল বলিয়া স্বীকার না করা, তাহাকে সমগ্রভাবে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলিয়া নিন্দা করা—মনে হয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসীয় বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ।

* * *

(গ) সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিজ্ঞানের মূল সূত্র

ইংরেজ শাসনের অব্যবহিত ফল হিসাবে বাংলাদেশে যে সাহিত্যের জন্ম, রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যাহার বিস্তার, তাহাকে বাংলা সাহিত্যের "স্বর্ণযুগ" বলা যাক বা না যাক, মার্কসীয় পদ্ধতিতে তাহার বিচার করিতে গেলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য বিচারের মূলসূত্র : সাহিত্য হইতেছে সামাজিক বাস্তবের প্রতিফলন। সমাজের স্তরে স্তরে শ্রেণী সংঘর্ষের প্রভাবে নিত্য যে আলোড়ন চলিতেছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে তাহাতে সাড়া দেয়। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া নির্ধারিত হয় সমাজের বিন্যাস কি ভাবে পরিবর্তিত হইবে ও সমাজের গতি হইবে কোন দিকে। সাহিত্য এই শ্রেণীচেতনা হইতে সৃষ্ট হইয়া সামাজিক পরিবেশের উপর প্রতিঘাত করে। মার্কসীয় মতে ফিউডাল হইতে বুর্জোয়া ও তাহা হইতে সমাজবাদ এই অভিমুখে পরিবর্তন ঘটাই সামাজিক প্রগতির লক্ষণ। রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ পর্বের সাহিত্য বিচারে আমাদের সর্বদা এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে তাহা এই অভিবর্তনে সহায়তা করিতেছিল কি না, এই সাহিত্যের প্রভাব ছিল শ্রেণী সংগ্রামের কোন পক্ষে। ইহা কি পুরাতন মনোভাব জীয়াইয়া রাখিতেছিল, না নূতনের জন্য পথ কাটিয়া দিতেছিল। এই ভাবেই সাহিত্য বিচারকে ব্যবহার করা চলে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার রূপে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এই বিচারে রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন নিরিখ স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই সাহিত্যের শ্রেণী বিচারের একমাত্র নিরি[illegible] হইতেছে তাহা **প্রত্যক্ষভাবে** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ বা তাহার **অত্যাচারকে** উদ্ঘাটন করিয়াছিল কি না (বড় হরফ আমার)। বলা বাহুল্য, এ বিচার সাহিত্যিক নহে, রাজনৈতিক। সেই সঙ্গে ইহাও জোর করিয়া বলা দরকার, এই খণ্ডিত মাপকাঠি দিয়া সাহিত্যের গুণবিচার একদেশদর্শী না হইয়া পারে না। সাহিত্য যাহার প্রতিফলন সেই সমাজ-মানস রাজনৈতিক চেতনার চেয়ে গূঢ়তর এবং সমাজবিপ্লব রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ব্যাপকতর। কোনো বিশেষ আন্দোলন, বিক্ষোভ বা সংগ্রাম, তাহার প্রতি কোন সাহিত্যিকের কি অভিমত, তাহা দিয়া স্যাহিত্য বিচার করিলে, বিশেষ করিয়া বিগত যুগের সাহিত্য সৃষ্টির বিচার করিলে—নিঃসন্দেহে বিড়ম্বিত হইতে হয়। সাহিত্য বিচারে লেনিনবাদের স্বরূপ বিবৃত করিতে গিয়া প্রখ্যাতনামা সোভিয়েট সমালোচক মিখাইল লিফ্‌শিৎস বলেন—"অতীত সংস্কৃতির মহৎ প্রতিনিধিদের

চেতনায় বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা পরস্পরকে জড়াইয়া থাকে। ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য। বিপ্লবী আদর্শ কদাচিৎ **প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে** সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।" ["The confusion of revolutionary and reactionary tendencies in the conscionsness of the great representatives of the old culture is an established historical fact. Revolutionary ideals have seldom been reflected *directly and immediately* in literature."] (বড় হরফ আমার)।

অতীতের মহৎ লেখক, শিল্পী ও মানবিক চিন্তানায়কগণের রচনায় কেন এই দ্বৈতভাব থাকে, তাহার কারণ দেখাইয়া লিফ্‌শিৎস্ বলেন, তখনকার দিনের সমসাময়িক গণ-আন্দোলনের অপরিপক্কতা ও ইতিহাসের ধারায় তাহাদের দ্বান্দ্বিক বিকাশ, ইহার মধ্যেই উক্ত দ্বৈতভাবের চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ["The immaturity of mass mevements and their contradictory growth in the course of history explain excellently the contradictions in the works of great writers, artists and humanists of the past ."]

কি করিয়া এই সাহিত্যের বিচার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন : লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় কেমন করিয়া কোনো শিল্পসৃষ্টিতে তাহার ঐতিহাসিক মর্ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, কেমন করিয়া পৃথক করিতে হয় তাহার মধ্যে মৃত হইতে জীবন্তকে, কেমন করিয়া স্থির করিতে হয় কোন অংশ ভবিষ্যতের অভিমুখী ও কোন অংশ অতীতের দাসত্বে চিহ্নিত। এইরূপ বাস্তব বিচারেই আছে প্রকৃত শ্রেণীগত বিশ্লেষণ। ["Leninism teaches us how to discriminate the historical content of works of art, how to seperate the living from the dead in them, how to determine what belongs to the future and what is the mark of a slavish past. In this concrete critique lies a real class-analysis."]

শ্রেণীসংঘর্ষ কি ভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাহা বুঝাইতে গিয়া লিফ্‌শিৎস বলেন—সাহিত্যে শ্রেণী-সংগ্রাম হইতেছে জনগণের প্রবৃত্তির সংগ্রাম প্রভুত্ব ও দাসত্বের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, ধর্মগত বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে, নির্মম নৃশংসতার বিরুদ্ধে, সভ্য অপমান ও মিষ্ট ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে। ["The class struggle in literature is the struggle of the peoples' tendencies against the ideology of domination and slavery, against religious

sterility, against cruelty, against polite insolence and suavity."]

ব্যক্তির মনে শ্রেণী-চেতনা কি ভাবে উদ্ভূত ও সঞ্চারিত হয় এই প্রশ্নের আলোচনায় মেনশেভিকদের ধারণা ছিল যে তাহা নির্ভর করে জন্মের উপর। এই ধারণাকে খণ্ডন করিয়া লেনিন প্রমাণ করিয়াছিলেন : কোনো লোকই কোনো বিশেষ শ্রেণীর ভাবাদর্শ লইয়া জন্মায় না, তাহাকে গড়িয়া উঠিতে হয়। প্রলেটেরিয়ান ভাবাদর্শ অর্থাৎ মার্কসবাদ শ্রমিকের চেতনার সহজ গাঢ়করণ মাত্র নয়, তাহার কারখানার স্বতোপ্রসূত ফলাফল নয়। প্রকৃত শ্রেণীচেতনা বিকশিত হয় কেবল মাত্র সমাজের **সকল শ্রেণীর জীবনের সকল রকম প্রকাশের —মানসিক, নৈতিক, রাজনৈতিক**—প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হইতে। ["Lenin proved that class consciousness does not originate automatically. No one is born an ideologist of a definite class ; he becomes one. Proletarian ideology i.e. Marxism is not a simple deepening of the psychology of the workers, not a spontaneous consequence of factory conditions. Real class consciousness develops only from observation of the life of *all classes in all its manifestations mental, moral and Political.*] (বড় হরফ আমার)।

রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ সম্পর্কে এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাতে কি লেনিনবাদী সাহিত্য বিচারের এই মূল সূত্রগুলি মানা হইয়াছে ? ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের সাহিত্য, এমন কি ভারতচন্দ্র ও আলাওল পর্যন্ত, ও ইংরেজী আমলের সাহিত্য রামমোহনে যার শুরু ইহাদের গুণগত পার্থক্য কি তাহাতে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে ? বাংলা সাহিত্যের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে সাহিত্য হিসাবে ইংরেজী আমলের সাহিত্যের তুলনায় তাহার পূর্বের যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ একান্ত নিষ্প্রভ। এই নূতন সাহিত্যের যেমন বৈচিত্র্য তেমনি বিস্তার। এবং এই উৎকর্ষের মূল উৎস নূতন ধনবাদী গণতান্ত্রিক সামাজিক চেতনা। দেশের অগণিত জনসাধারণ শিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় এই নূতন চেতনার অংশভাগ হইতে পারে নাই, নূতন সাহিত্যের আস্বাদ পায় নাই, তবু তাহাদের অন্তরের কথা অনেকাংশে এই সাহিত্যে রূপায়িত। বিভিন্ন লেখকগণের রচনায়, বিষয় নির্বাচনে ও লিখনভঙ্গিতে ব্যক্তিগত ঝোঁকের প্রকাশ থাকিলেও এই যুগের লেখকেরা একই 'স্কুল-এর' লেখক—যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ,

বাইরন, শেলী, কীটস, কোলরীজ, স্কট ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনায় অবিসংবাদিত পার্থক্য সত্ত্বেও ইহারা সকলেই উনিশ শতকের প্রথম পাদের রোমান্টিক কবি। তাই বুর্জোয়া বাংলা সাহিত্যের বিচারে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্ন একদিকে এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে, এইরূপ মূলগত বিভেদের রেখা টানার চেষ্টা সাহিত্যিক বিচারে ঘাতসহ নয়। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি পাঠক 'নীলদর্পণ' ও হুতোম-এর সাংস্কৃতিক মূল্য কোনোদিন অস্বীকার করে না ?, যেমন অস্বীকার করে নাই 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী' 'মুচিরাম গুড়' ও 'কমলাকান্তের' সাংস্কৃতিক মূল্য। বাংলানাটকের ইতিহাসে, রচনার শৈথিল্য সত্ত্বেও, 'নীলদর্পণের' শীর্ষস্থান ও স্থানে স্থানে সুরুচির ব্যত্যয় সত্ত্বেও ব্যঙ্গ রচনায় হুতোমের শীর্ষস্থান বাঙালী পাঠকের নিকট মোটেই নূতন আবিষ্কার নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইংরেজী আমলের বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্নই কি বাঙালীর সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ? এই অসুবিধাজনক প্রশ্ন রবীন্দ্র গুপ্তের মনে জাগিয়াছিল। তাই প্রকাশ রায়ের প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা ঢাকিবার জন্য তিনি মধুসূদনকেও এই দলে টানিয়াছেন তাঁহার "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এই প্রহসনের জোরে, যাহাতে 'মেঘনাদবধ'কেও প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের তালিকাভুক্ত হইতে না হয়। কিন্তু এখানেও প্রশ্নের অবসান হয় না। প্রশ্ন এই—তাহা হইলে কি বাঙালী পাঠককে শিখিতে হইবে যে 'বুড়ো শালিক' 'মেঘনাদবধ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি, মাইকেলের অমরত্বের জন্য কেবল 'বুড়ো শালিক' লিখিলেই চলিত, "মেঘনাদবধ" লেখার প্রয়োজন ছিল না ? এ প্রশ্নও রবীন্দ্র গুপ্তের সচেতন মন এড়াইতে পারে নাই। তাই 'মেঘনাদবধ'এর সপক্ষে তিনি রায় দিতেছেন ইহা প্রগতিশীল বিপ্লবী সাহিত্য, কেন না মধুসূদনের "কাব্যগ্রন্থগুলি দুদিক থেকে প্রাচীন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে প্রথমত পুরাণের দেবদেবীর চরিত্র নিয়ে মানুষের মত করে আধুনিক যুগের ভাবধারায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে ; দ্বিতীয়ত কাব্য রচনার প্রাচীন" বাঁধা ধরা অনুশাসন আগ্রাহ্য করে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেছেন। এই মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ আমার ধারণায়, রবীন্দ্র গুপ্ত মধুসূদনের কাব্যাবলীর সম্বন্ধে সত্য বিচার করিতে গিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট হইয়াছেন।

রবীন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য হইতে আমরা কি এই কথা বুঝিব যে, মাইকেলের কবি-কৃতিত্ব কেবল ছন্দ-শিল্পী হিসেবে নূতন ছন্দ প্রবর্তন করায় ? এ বিচার আংশিক সত্য হইলেও অত্যন্ত ভাসাভাসা। কারণ সাহিত্যে প্রকাশের,

আঙ্গিকের কোনো বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে না বক্তব্যেরও বৃহৎ পরিবর্তন না ঘটিলে। নূতন 'কণ্টেণ্ট'ই কেবল পারে নূতন 'ফর্ম্' উদ্ভাবন করিতে। আর পুরাণের দেব-দেবীতে মানুষীভাব আরোপ করা একান্তই মাইকেলের বিশেষত্ব নহে; মঙ্গলকাব্যে, চণ্ডীতে, বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহার অসংখ্য উদাহরণ আছে। মাইকেলের যাহা প্রকৃত বিশেষত্ব, রবীন্দ্র গুপ্ত তাহা ঠিকই ধরিয়াছেন—তাহা হইতেছে, আধুনিক যুগের ভাবধারার উপযুক্ত প্রকাশ।

মূল প্রশ্নটি এইখানেই—"আধুনিক যুগের ভাবধারা" বলিতে আমাদের কি বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্র গুপ্তের সমগ্র প্রবন্ধের লক্ষ্য প্রমাণ করা যে, ইংরেজী আমলের বাঙলাদেশে একটিমাত্র আধুনিক ধারা আছে যাহাকে প্রগতিশীল বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য; তাহা হইতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সমর্থন। কিন্তু যে কাব্যাবলীর মহত্ত্বে মধুসূদন আধুনিক বাঙালী কবিদের আদিগুরু—'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমা', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'—ইহাদের কোনোটিতে কি তাহার সন্ধান মেলে? না, মেলে না। তাই রবীন্দ্র গুপ্তের সূত্রানুযায়ী স্ব-বিরোধী না হইয়া মাইকেলকে বৃহৎ বিপ্লবী কবি বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচারেও রবীন্দ্র গুপ্তকে অনুরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার মতে, রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যিক রচনা—"বৌঠাকুরাণীর হাট"—সাহিত্যের বিচারে হয়ত যাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু 'বলাকা'কেও তিনি প্রগতির শিবির হইতে ছাড়িতে রাজী নন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে 'বলাকা'র শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত। কিন্তু 'বলাকা'র কোন্ কবিতায় আছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সমর্থন? তখনকার সমসাময়িক জড়বিজ্ঞানে যে ব্রহ্মাণ্ড গতির, 'কস্‌মিক মোশন'-এর কথা প্রচারিত হইতেছিল, 'বলাকা' সেই আধুনিক ভাবধারার কাব্যময় প্রকাশ। এখানে স্ববিরোধী না হইয়া 'বলাকা'-কে প্রগতিশীল বলা চলে না।

অথচ প্রকৃত লেনিনবাদী সাহিত্য-বিচারে এই দোটানায় পড়িতে হয় না, দোফাঁদে পা দিতে হয় না। লেনিনবাদী সাহিত্য বিচারে প্রথম বিচার্য, অতীতের যে সাহিত্যিকের রচনার বিচার হইতেছে তাঁহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ, রাজনৈতিক মতামত নয়। লিফশিৎসের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচক স্মির... বলিয়াছিলেন: "লিফশিৎস-এর মতে মনে হয়—কাভেলিন, আকসাকভ, ... প্রভৃতি লেখকেরা শোষিত শ্রেণীর ভাবাদর্শের প্রকাশক ছিলেন না।" উত্তরে

লিফশিৎস বলেন: "মোটেই তা নয়। কাভেলিনেরা নিশ্চয়ই ছিলেন শোষিত শ্রেণীর সমর্থক লেখক। কিন্তু তোমরা যদি আমার পূর্বোক্ত মতকে খণ্ডন করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে প্রথমে প্রমাণ করিতে হইবে যে কাভেলিনেরা ছিলেন অতীতের বৃহৎ লেখক-শিল্পী-মানবিকগণের অন্যতম। তোমরা যদি কাভেলিন প্রভৃতিকে পুশকিন, গোগোল ও টলস্টয়ের শ্রেণীতে বসাইতে চাও, তাহা হইলে কেহই তোমাদের কথা শুনিবে না। ইহার জন্য আমি দুঃখিত।" ["This is not so. Of course the Kavelins were ideologists of class exploitation. But if you wish to refute my foregoing passage, demonstrate first that the Kavelins were great writers, artists and humanists of the past. But when you lump together with the Kavelins such writers as Pushkin, Gogol and Tolstoy as 'ideologists of the exploited classes'—I am sorry, but no one will listen to you."]

বাংলা সাহিত্যের বিচারে এই নীতি প্রয়োগ করিতে গেলে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত এই যে, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অতীতের মহৎ লেখক-শিল্পী-মানবতাবাদী ছিলেন কি-না। মনে হয় না, এ প্রশ্নের উত্তরে পাঠক মহলে দ্বিমত ঘটিতে পারে। এখন প্রশ্ন ওঠে এই যে, মহৎ শিল্পী হইলেই কি তাঁহাকে প্রগতিশীল বিপ্লবী শক্তির আধার হইতে হইবে? এই প্রশ্নের শেষ উত্তর দিয়া গিয়াছেন স্বয়ং লেনিন। তিনি বলেন, **কোন শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ হন, তাহা হইলে তাঁহার রচনায় বিপ্লবের কোনো না কোন মর্মগত অংশ প্রতিফলিত না হইয়া পারে না।** ["An artist truly great must have reflected in his work at least some essential aspects of the revolution."]

সুতরাং রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ যদি অতীতের মহৎ লেখক-শিল্পী-মানবিক হন, তাহা হইলে তাঁহাদের রচনায় ইংরেজী আমলের বাংলা দেশে যে বিরাট সমাজবিপ্লবের সূচনা হইয়াছে তাহার আংশিক প্রকাশ নিশ্চয়ই থাকিবে। তাঁহাদের রচনায় প্রতিক্রিয়াশীল অংশও নিশ্চয়ই থাকিবে এবং নিশ্চয়ই আছেও। কিন্তু রবীন্দ্র গুপ্ত কেবল এই দিকটিতে জোর দেওয়ায় তাঁহার সিদ্ধান্ত একপেশে হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের আচার্যগণের বিচার সম্বন্ধে লেনিনবাদের মূল শিক্ষাই হইল এই যে, তাঁহাদের কৃতিত্বের

অভ্যন্তরে যে স্বতোবিরোধিতা আছে, তাহা হইতে নিষ্কাশিত করিয়া টানিয়া
বাহিরে আনিতে হইবে তাহার বিপ্লবী মর্ম ও তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে শ্রেণী
সংগ্রামের উপাদান হিসাবে। বুর্জোয়া লেখকগণের দুর্বল দিককে বুর্জোয়া
শাসকেরা নিশ্চয়ই তাহাদের কাজে লাগায়, কিন্তু তাঁহাদের বিপ্লবী প্রেরণা
তাহাতে লুপ্ত হইয়া যায় না। বিস্মার্ক হেগেলের দর্শনকে পররাষ্ট্র-গ্রাসী জার্মান
সাম্রাজ্যবাদের দর্শন হিসাবে ব্যবহার করিতেন। তাই বলিয়া কি হেগেলের
বিপ্লবী প্রেরণা অস্বীকার করিতে হইবে? গ্যেটে ছিলেন ভাইমার রাজের
সভাকবি। তিনি এমন কি ফরাসি বিপ্লবেরও বিরোধিতা করিয়াছিলেন আর
করিয়াছিলেন জার্মান-বিজয়ী ফরাসী বীর নেপোলিয়নকে সাদর অভিনন্দন।
অথচ দেখিতেছি সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাঁহার দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশাল
উৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজিকার দিনের পৃথিবীতে যে আন্দোলন
মার্কসবাদী মহলে সবচেয়ে বিপ্লবী বলিয়া গৃহীত, সেই বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের
সমর্থনে গ্যেটের নাম সোভিয়েট দেশে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করা হইতেছে। আমাদের
দেশের নেহরু সরকার রবীন্দ্রনাথের রচনাকে, হিন্দু মহাসভাপন্থীরা বঙ্কিম
বিবেকানন্দের রচনাকে ও দর্শনকে তাহাদের কাজে লাগাইলে তাই আমাদের
বিচলিত হইবার কিছু থাকে না। যে সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতে স্বাধীনতা
সংগ্রামের প্রথম গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসাবে রবীন্দ্র গুপ্ত সমস্ত প্রগতিশীল
সংস্কৃতির একমাত্র মাপকাঠি ধরিতে চাহেন, তাহার সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা
বিনায়ক সাভারকরের একটি বিখ্যাত পুস্তক আছে, যাহার নাম—১৮৫৭
সালের ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ("The war of Indian Independence
of 1857")। স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরোল তাঁহার 'ভারতীয় বিক্ষোভ' ("Indian
Unrest) নামক গ্রন্থে সাভারকরের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিতেছেন ইহা মিউটিনির
ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। ইহাতে ঘটনার বিকৃতি সত্ত্বেও
প্রচুর গবেষণা আছে, আর আছে বর্বরতম ঘৃণার সহিত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক
ক্ষমতার সংযোগ। ["B. Savarkar, 'The war of Indian Independence
of 1857' is in its way a very remarkable history of the Mutiny,
combining considerable research with the grossest perversion
of facts and great literary power with the most savage hatred."]
তাই বলিয়া কি সাভারকরকে আজ আমাদের "বীর" বলিয়া পূজা করিতে হইবে?
আমাদের কাজ হওয়া উচিত বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অন্তরস্থ

মূল বিপ্লবী প্রেরণা উদ্ঘাটিত করিয়া প্রতিক্রিয়ার শিবিরকে দুর্বল করা, তাঁহা-
দিগকে "মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীল" ঘোষণা করিয়া প্রতিক্রিয়ার শিবিরকেই সবল করা
নয়। আমাদের ভুলিলে চলিবে কেন বুর্জোয়া সভ্যতার শেষ প্রগতিশীল পর্যায়,
উদ্ধত জাতীয়তার বিরুদ্ধে উদার মানবিকতার আহ্বান টমাস মান ও রোঁমা রলাঁর
মতো রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। আমাদের ভুলিলে চলিবে কেন,
বঙ্কিমচন্দ্রের মানসসৃষ্টি ভ্রমর, শৈবলিনী, আয়েষা, শান্তি, প্রফুল্ল—এখনকার
স্বাধীনতাকামী বাঙালী রমণীর মানস জননী। আমাদের ভুলিলে চলিবে কেন,
দেশের জনসাধারণের ক্লৈব্যে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতিকারার্থে বিবেকানন্দ যখন
দেশের যুব সমাজকে শোনান—"তোমার জন্মভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন, তুমি
বীর হও"—তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র
সংগ্রামশীল অগ্নিযুগের যোদ্ধাদের গুরুর পর্যায়ে উপনীত হন। ইহাও আমরা
ভুলিব না যে রামমোহন—রবীন্দ্রনাথের বেদান্তভাষ্য, বঙ্কিম—বিবেকানন্দের
গীতাভাষ্য—ইহাদের গভীর উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ততটা নয় যতটা অন্ধ
বিশ্বাস ও অলৌকিকতার ক্ষেত্রে আধুনিক যুক্তিবাদ ও আদর্শ মানবিকতাবাদের
প্রতিষ্ঠা। আর হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই যদি প্রগতিশীলতার চরম পরীক্ষা হয়,
তাহা হইলে রামমোহনের চেয়ে প্রগতিশীল কাহাকে আধুনিক ভারতে খুঁজিয়া
পাওয়া যায়?

* * *

(ঘ) সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডিমোক্রাটিক ফ্রন্ট সংগঠন

ইহার পরেও প্রশ্ন উঠিতে পারে অতীতে যাহাই হউক বর্তমানে মার্কসবাদীরা
শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি; তাহাদের বর্তমান কর্তব্য শ্রমিক শ্রেণীর সাহিত্য,
শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা। বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান শত্রু
সুতরাং এই শ্রেণী-শত্রুর রচনা সম্বন্ধে, তাহাদের স্বতোবিরোধী ঐতিহ্য সম্বন্ধে
এতো মাথা ঘামাইবার কি প্রয়োজন? আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া
বর্তমান অভিজ্ঞতা হইতে নূতন করিয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিব।

এ প্রশ্ন এদেশে নূতন হইলেও ইতিহাসে নূতন নহে। নবজাত সোভিয়েট
রাষ্ট্রের সাহিত্যিক-গোষ্ঠী "প্রলেটকাল্ট" (১৯১৭-১৯২২) ঠিক এই প্রশ্নই তুলিয়া-
ছিল এবং তাহারও উত্তর দিতে হইয়াছিল স্বয়ং লেনিনকেই। তখন লেনিন
একটি প্রবন্ধে লেখেন—"ধনবাদ আমাদিগকে যে-সংস্কৃতি দিয়া গিয়াছে, তাহা

আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে সমাজবাদ। সব রকমের বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, সব রকমের সাহিত্য ও শিল্প আমরা অবশ্যই লইব।” [“All the culture which capitalism has left us must be taken and socialism built out of it. All science, engineering, all knowledge and art must be taken.”]

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসের বিখ্যাত বক্তৃতায় (২রা অক্টোবর, ১৯২০) লেনিন বলেন—“সমগ্র মানবজাতির বিকাশের ধারা বাহিয়া যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা যদি তাহার সঠিক স্বরূপ স্পষ্ট বুঝিতে না পারি, এই সংস্কৃতিকে যদি আমরা পুনরায় প্রয়োগ করিতে না শিখি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। ইহা না বুঝিলে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করিতে পারিব না। প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি একটা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যাপার নয়। প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতিতে বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাবি করেন, এমন কয়েকজন ব্যক্তির মস্তিষ্ক-প্রসূত উদ্ভাবনও তাহা নয়। এই ধারণাগুলি একদম বাজে। আমলাতন্ত্রী সমাজ, সামন্ততন্ত্রী সমাজ, ধনতন্ত্রী সমাজ—ইহাদের শাসনের মধ্যেও মানবসমাজ যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়াছে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি হইবে তাহারই স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি। [“Unless we clearly understand that only by an exact knowledge of the culture created by the whole development of mankind, that only by re-working this culture, is it possible to build proletarian culture, unless this is understood, we shall not be able to solve this problem. Proletarian culture is not something that has sprung nobody knows whence, it is not an invention of those who call themselves experts in proletarian culture. This is all nonsense. Proletarian culture must be the result of a natural development of the stores of knowledge which mankind has accumulated under the yoke of capitalist society, landlord society and bureaucratic society.”] সুতরাং দেখা যাইতেছে, সোভিয়েট দেশে শ্রমিক সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া লেনিন “রূপান্তরের দাবি” করিতেছেন, পূর্বতন সংস্কৃতিকে “ধ্বংস ক’রে তার স্থানে” (রবীন্দ্র গুপ্তের ভাষায়) অন্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার দাবি করিতেছেন না।

লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় কমরেড জদানভ্-এর ১৯৪৬ সালের বক্তৃতা হইতে প্রকাশ রায় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ শুরু করিয়াছেন, তাহার

প্রকৃত লক্ষ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। জ্‌দানভের সমগ্র প্রবন্ধটি সতর্কভাবে পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি এখানে সকল দেশের সকল কালের বুর্জোয়া সাহিত্যের বিচার করিতেছিলেন না। সোভিয়েট দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সমাজবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহার শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে ; সেখানে নূতন উন্নততর সংস্কৃতি সোভিয়েট লেখকেরা ও শিল্পীরা গড়িয়া তুলিতেছেন, সোভিয়েট জনসাধারণের অতুলনীয় শৌর্য ও আত্মত্যাগ যাহার বাস্তব ভিত্তি। ইওরোপের প্রাচীন দেশগুলিতে ধনবাদ ক্ষয়িষ্ণু, সেখানে এই যুগে সৃষ্টি হইতেছে এক মুমূর্ষু সংস্কৃতি। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট দেশে এমন কয়েকজন লেখককে পাওয়া গেল যাঁহারা এখনও এই অস্তমিত পশ্চিমের দিকে আকুল নয়নে তাকাইয়া আছেন। ইঁহাদের সমালোচনা করিতে গিয়া জ্‌দানভ্ অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন বর্তমানে ইওরোপের গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতির দিকে, যাহাকে অস্বীকার করা ও আক্রমণ করা সোভিয়েট লেখকদের কর্তব্য। এই মন্তব্যকে সমগ্র বুর্জোয়া সাহিত্য-বিচারের মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করিলে জ্‌দানভের বিচক্ষণতার প্রতি অবিচার করা হয়।

আমাদের দেশে বুর্জোয়া সংস্কৃতির আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ যুগের যে মূল সামাজিক সমস্যা ছিল, আমরা তাহা হইতে কিছুটা দূরে সরিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের যুগে সামাজিক বিপ্লবের অগ্রগামী পদাতিক ছিল ইংরেজী শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আমাদের যুগে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে। এবং এই নূতন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতা শ্রমিক-শ্রেণী। তাই শ্রমিক শ্রেণীকে বাদ দিয়া আজ আমাদের দেশে সংস্কৃতি-আন্দোলন অসার্থক। কিন্তু লেনিন শিখাইয়া গিয়াছেন, শ্রমিক শ্রেণী কেবল তাহার জন্মের মাহাত্ম্যেই নেতৃত্ব করিতে পারে না। তাহাকেও মার্কসবাদে সুশিক্ষিত হইতে হইবে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত এই শিক্ষাদানের ভার ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হাতে। তাহাতে শিক্ষা দিতে গিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা। তাই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষকগণকে নিজেদের শ্রেণীচেতনার উপরে উঠিয়া শ্রমিক শ্রেণীর চেতনায় প্রবেশ করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রয়োজন শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনযাত্রার সহিত, তাহাদের সুখ-দুঃখের সহিত, তাহাদের শক্তি ও দুর্বলতার সহিত, তাহাদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। শ্রমিক-শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শ্রমিকের সহযোদ্ধা কৃষকের

বেলাতেও এই কথাগুলি খাটে। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় বাদ দিয়া এখন কোনো সাহিত্যিক রচনাই সবল, সুন্দর ও সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রমিক-কৃষকের চেতনায় প্রবেশ করিতে পারে একটি মাত্র উপায়ে—মার্কসবাদের সম্যক অনুশীলন ও তাহার সঠিক প্রয়োগে। কারণ মার্কসবাদ ষোল আনা গ্রহণ করিতে পারিলে আর মধ্যবিত্তে ও শ্রমিক-কৃষকে জন্মগত প্রভেদের অর্থ থাকে না। তখন উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি হয়—কাহার আছে কি পরিমাণে মার্কসবাদে দখল ও প্রয়োগদক্ষতা। শ্রমিক-কৃষকের রচনা অথবা তাহাদের সমগ্র শ্রেণীর বোধগম্য রচনা না হইলে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি হয় না—এ ধারণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। শ্রমিক শ্রেণীর অধিনায়ক হইয়া প্রকাশ রায় "পরিচয়"-এ প্রকাশিত যে-তিনটি প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়াছেন—"সোভিয়েট বায়োলজি", "বুদ্ধিবিলাসীর ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌","মার্কসবাদের "নয়াভাষ্য" —ইহাদের কোনটি বর্তমানে ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণীর বোধগম্য ?

মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর আর একটি প্রধান কর্তব্য, মৃতপ্রায় লোক-সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করা। বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রকৃতিগত প্রবণতাই এই যে, তাহা পূর্বতন লোক-সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করিয়া নিজেকে বিস্তার করে। মার্কসবাদী সংস্কৃতি-কর্মীর কর্তব্য, এই লুপ্তপ্রায় লোক-সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইয়া তাহার পুরাতন কাঠামোয় নূতন আবেগের সঞ্চার করিয়া তাহাকে উন্নত করিয়া তোলা। সমাজবাদী সোভিয়েট প্রাচ্যে ধনবাদের বাধা দূর হওয়ায় লোক-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেখানেও তাহার সহিত শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া সংস্কৃতির আন্তরিক শত্রুতা নাই। বুর্জোয়া যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা সেখানে আর স্বল্পসংখ্যক শিল্প-রসিকের সম্পত্তি নন, নূতন শিক্ষিত বিরাট জনসমাজের নিত্য আনন্দের উৎস।

আমাদের দেশে সমাজবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হইলেও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যবনিকা পতন হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় ভারতে সামন্তবাদ এখনও প্রবল। ইহার জন্য অপরিহার্য ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে "ডিমোক্রাটিক ফ্রন্ট" সংগঠন। ঔপনিবেশিক দেশসমূহে এই ফ্রন্ট সংগঠনের কৌশল হিসাবে কমিণ্টার্নের ষষ্ঠ বিংশ-কংগ্রেস যে-নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহার কার্যকারিতা এখনও বাতিল হইয়া যায় নাই।। তাহাতে বলা হইয়াছে, পরাধীন দেশে মার্কসবাদিগণের অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে একটি প্রধান করণীয় :

বিভিন্ন উপজাতিগুলির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নরনারীর সমান অধিকার

দাবি ; রাষ্ট্র হইতে ধর্মকে পৃথক করা ; জন্মগত জাতিভেদের বিলোপ ; রাজনৈতিক শিক্ষার এবং গ্রামে ও নগরে জনসাধারণের শিক্ষার স্তরকে উন্নত করা ; ইত্যাদি। [Establishment of equal rights for nationalities and of sex-equality ; (equal rights for women); seperation of church and state and abolition of caste-distinctions ; political education and raising of the general cultural level of the masses in town and country ; etc.]

আমাদের দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এখনও চূড়ান্ত সাফল্য না হওয়ায় মার্কসবাদিগণের এই সকল কর্তব্য এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। এই কর্তব্য সম্পাদনে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রচলিত বুর্জোয়া সাহিত্যকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায় ; কারণ, এই করণীয়গুলির প্রত্যেকটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহাতে আগত বিপ্লবের বিরোধিতা না করিয়া বরং সহযোগিতা করা হয়। কমিণ্টার্নের এই সঠিক নির্দেশ বিস্মৃত হইলেই হয় মার্কসবাদ খণ্ডিত ও ডিমক্রাটিক ফ্রণ্ট বিকলাঙ্গ।

৪. ১১. ৪৯ —নীরেন্দ্রনাথ রায়

ভ্রম সংশোধন

অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ছাপার কাজ সারিতে হইয়াছে বলিয়া এই সংখ্যায় অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গেল। কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। পঃ সঃ

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬	১৬	'মার্কসের জানা ছিল না'	'মার্কসের অজানা ছিল না'
৫৯	১	'এই মার্ক্স্‌-এর নিরিখে'	'এই মার্কসীয় নিরিখে'
৫৯	৩	বাদে পোড়া	বাজে পোড়া
৫৯	১৩	উল্লাভুল	উল্কাঙ্গুল

মহাচীনের শিল্পীদের জয়যাত্রা

মহাচীনের প্রধান সেনাপতি চু-তে ১৯৩৯ সালে অষ্টাদশ গ্রুপ সেনাবাহিনী পরিচালনার সময়ে একটি কবিতা লেখেন, যে-কবিতা মুক্তি ফৌজের অধিকাংশের মুখে মুখেই তখন গীত হয়। চীনের রাষ্ট্রনায়করা প্রত্যেকেই প্রায় গভীর দরদ দিয়ে তাদের কথা কবিতায় লিখেছেন—সে কবিতা স্পর্শ করেছে মরণজয়ী মহাচীনের কোটি কোটি জনতাকে। কারণ মাও কিংবা চু-তের কবিতা চীনা জনতার মনের কথাকেই সবল দৃপ্ত ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছে। কবিতার গতি আর প্রকৃতি সাহিত্যের ধারা ও তার বিপ্লবী চেহারা এ নিয়ে মাও এবং চীনের বিপ্লবী নেতারা দ্বিধাহীন ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, মার্কসবাদকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন।

মার্শাল চু-তের সেই ঐতিহাসিক কবিতার কয়েকটি পংক্তি আমি এখানে অনুবাদ করছি :

"তাইহাংশান পাহাড়-রাজির পথ বেয়ে চলেছি আমরা
আমাদের ঘোড়ার পায়ের খুর ডুবে যাচ্ছে গভীর তুষারপাতের মধ্যে
অক্টোবরের প্রচণ্ড শীতে পাহাড়ও যেন জমাট বেঁধে গেছে
হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত কাপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে এই তীব্র শীত।
আমাদের গায়ে নেই কোন মোটা শীত বস্ত্র—
উত্তাপ চাই—আরও উত্তাপ
এই তীব্র আকাঙ্খার একটাই সহজ সরল জবাব এসেছে আমাদের
মনে—

এগিয়ে চল, দিন রাত্রি পাহাড় নদী জঙ্গল পেরিয়ে
হত্যা কর সহস্র সহস্র শত্রুকে
এই কঠিন সংগ্রামেই উত্তপ্ত হয়ে উঠব আমরা
জীবন্ত উত্তাপ জাগিয়ে তুলব আমরা আমাদের দেহে।"

এই সহজ জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল চীনের বিপ্লবী গণবাহিনীর পক্ষেই। জীবনের সমস্ত সমস্যা মীমাংসার সব থেকে অমোঘ এবং সব থেকে স্বাভাবিক পথ

বেছে নিয়েছিল চীনের কোটি কোটি জনতা যার পুরোভাগে ছিল সমস্ত দুনিয়ার মানুষের মনে অফুরন্ত জীবনের আহ্বান জাগিয়েছে যে লাল পতাকা সেই রক্তলাল ঝাণ্ডার বিপ্লবী বাহকেরা।

এক নূতন জীবন, নূতন দর্শন, নূতন সাহিত্য, নূতন সংস্কৃতি, নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরী হয়েছে এই মহাসমরের অঙ্গনে।

চীনের বিদ্রোহী লেখিকা তিং লিং এ্যানা লুইস্ট্রং'এর কাছে বলেছিলেন : "সাহিত্যের গতি সম্পর্কে আজ আর আমি মাথা ঘামাই না, ছ মাস ধরে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সামনের পরিখাতে রয়েছি, সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্পর্কে আমার সামনে পথ আজ সাফ হয়ে গেছে। সাহিত্যিকেরও একটিই মাত্র কর্তব্য—দেশকে মুক্ত করা! সাহিত্যের নীতি নিয়ে বিতণ্ডা করবার আজ আর ফুরসত নেই—আমি লিখব শুধু এ মুক্তি যুদ্ধে দুর্দম বেগে এগিয়ে যাবার প্রেরণা সমস্ত মানুষের মনে জাগিয়ে তুলবার জন্যে।"

শিল্পী শুধু নিছক শিল্পী নয়, সে সৈনিকও এবং সৈনিক শুধু শিল্প সংস্কৃতির চেতনাহীন সৈনিক নয় সে সঠিক শিল্পীও বটে। শিল্পীর মত গভীর অনুভূতি আর সৈনিকের মত কঠিন প্রতিজ্ঞা এই দুইয়ের মিশ্রনেই চীনের মুক্তি ফৌজের জন্ম।

বছরের পর বছর ধরে যে দুঃসহ যন্ত্রনা কোটি কোটি মানুষ ভোগ করছে চীনের মুক্তি যোদ্ধাদের প্রত্যেকের মনের তন্ত্রী ছিল সেই সচেতনায় বাঁধা এই অনুভূতিই তাকে যেমন গভীরভাবে ভালবাসতে শিখিয়েছে দেশের অগণিত জনতাকে ঠিক তেমনি ভাবেই তাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। দুনিয়াজোড়া সেই সমস্ত বর্বর শত্রুদের যারা দেশে দেশে ডেকে এনেছে অনাহারে মৃত্যু আর বিভীষিকা সাম্রাজ্যবাদের রথচক্র আর তার জোয়ালে বাঁধা দেশের বিশ্বাসঘাতকদের বীভৎস ছোরা চীনের মেহনতী মানুষের মনে সৃষ্টি করেনি মৃত্যুভয়—মৃত্যুভয়হীন মুক্তিরণের আহ্বান জাগিয়েছে তার মনে।

চীনা বামপন্থী লেখক চেং কেঙউ ১৯৩০ সালে লিখেছিলেন : "সাহিত্যিকের ভালবাসা যেমন গভীর তেমনি তীব্র তার ঘৃণা। সাহিত্য হচ্ছে যুগের মনের চেহারা। সাহিত্যিকেরা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রধান সৈনিক। যা কিছু অন্যায় আর কুসংস্কারের বিকৃত বুদ্ধিতে যা কিছু আচ্ছন্ন, সবার বিরুদ্ধেই চলবে আমাদের সুস্থ জীবন প্রতিষ্ঠার নিরলস সংগ্রাম।" মাও তুনের লেখা উপন্যাস 'মধ্যরাত্রি,' মাঞ্চুরিয়ান গেরিলা সাহিত্যিক সিয়াও চুন'এর লেখা 'অগস্ট

মাসে চীনাগ্রাম' তিং-লিং'এর লেখা কিসান মজুরের জীবনের বাস্তব ছবি —প্রত্যেকের মধ্যেই প্রতিভাত হয়েছে এই প্রতিজ্ঞা। দেশের প্রতি কোণে কোনে চলছিল যে বিপুল বিপ্লব যার মধ্যে দর্শক ছিল না কেউ, প্রত্যেকেই ছিল অংশীদার সেই মহামুহূর্তে চীনের গণমানসে জেগে উঠেছে যে শিল্প আর সংস্কৃতির ছবি তা চীনের ঐতিহাসিক বিপ্লবের মতই মহান এবং ব্যাপক। শত্রুর সাথে আপসের বিন্দুমাত্র চিন্তা সেই আগুনের মধ্যে থাকতে পারে নি। ঠিক তেমনি মহাসমুদ্রের মত অগাধ ভালবাসা আর দরদ ফুটে উঠেছে চীনের শিল্পে আর সাহিত্যে চীনের অগণিত জনতার জন্যে। দেশপ্রেম আর বিশ্ব-শ্রমজীবী মানবতার প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা—এই হয়েছে চীনা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য।

চীনের বিদ্রোহী তরুণ কবি নিয়ে-এর—যার সঙ্গে তুলনা করা চলে বাংলার কিশোর বিপ্লবী কবি সুকান্তের—চব্বিশ বছরে শত্রুর হাতে হয় তার সলিলসমাধি। নিয়ে-এর ছিলেন কুলি, তারপর সৈনিকজীবনে হয় তার কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ। এর যে অন্তস্পর্শী আবেদন সারা দুনিয়ার অত্যাচারিত মানুষের কাছে, তার প্রতি ছত্রে ছত্রে মনে আসে কবি সুকান্তের মর্মস্পর্শী আহ্বানগুলো। নিয়ে এরয়ের ঐতিহাসিক কবিতা ('এই মহাযাত্রার পথে আমাদের রক্তের ধারা মিশেছে একসাথে)" থেকে কয়েকটি পংক্তি :

"এক সাথে এক সাথে বয়ে চলি মোরা দুঃসহ শোষনের বোঝা
এক সাথেই চলি মোরা তাই ভয় করিনা মৃত্যু আর যন্ত্রনা
চল এক সাথে আগে—দুনিয়া জোড়া মোদের এক লড়াই
মহামুক্তির পথে চলি এক সাথে—এক সাথে মুক্তির পথে পা
বাড়াই।"

এতটুকু ভরসার অভাবের কথা নেই বিদ্রোহী কবির ভাষণে দুর্গমপথের সমস্ত যাত্রীকে নিশ্চিন্ত নির্ভয়তায় এগিয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। লক্ষ কোটি চীনা মেহনতী মানুষের মুখে আজ তাই উচ্চারিত হচ্ছে এরয়ের এই সঙ্গীত।

এর সঙ্গে আমি উদ্ধৃত না করে পারছি না। লু-চির লেখা লা মর্সাইয়ের মত ঐতিহাসিক কবিতা—এ কবিতাকে তুলনা করা চলে একটি জ্বলন্ত মশালের সাথে—যে মশালের আলোয় অগণিত চীনা মানুষের মনে জেগে উঠেছে প্রতি-রোধের অজেয় প্রতিজ্ঞা,—লুচি আর লিউ-লিয়াং-মোর কণ্ঠ আজ চীনের প্রান্ত

থেকে অপর প্রান্ত প্রতিধ্বণিত হচ্ছে— চীনের মুক্তি যুদ্ধ রূপ নিয়েছে সঙ্গীত আর কাব্যে। লু-চি লিখেছেন :

"উয়ো-মেন সি জি ইয়া লো টি মিন চু
উয়ো মেন স্থ ইয়াও চ্যান চেঙ্
আমরা শোষিত মহামানবতা
সংগ্রামই আমাদের ব্রত।
সংগ্রাম আমাদের শৃংখল ভাঙ্গবার
সংগ্রাম আমাদের মুক্তি ও শান্তি আনবার
চলো আগে, লও হাতিয়ার, জাগো।
ঐ সান্টুঙ্ ঐ হোপেই
ঐ রণক্ষেত্র।
হঠাও শত্রুকে, হঠাও হানাদারদের,
হঠাও ওদের সীমান্তের বাইরে
রক্তের বন্যায় আমরা মুক্তি আনবই, আনব মহাশান্তি।"

এই আহ্বান যখন জানিয়েছেন লু-চি তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে লি চেং'এর চাষী মেয়েদের কথা—যেখান থেকে তিন হাজার মেয়েকে শত্রু সৈন্যরা চালান করেছিল তাদের ফৌজের ছাউনিতে, তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কয়েকশত শিয়াও কিউইর (বালসেনা) চেহারা—যাদের দিয়ে হোপেইয়ের রণক্ষেত্রের পিছনে শত্রুরা বেয়নেটের ধার পরীক্ষা করেছিল। এই চাষী মেয়েরা বা বালক সৈনিকেরা মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও অসম্মান বা আত্মসমর্পণ মেনে নেয়নি। রিক্ত হস্তেও তারা বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে লড়তে লড়তে জীবন দিয়েছেন। চীনা মেয়েদের কথা বলতে যেয়ে প্রসঙ্গত চীনার তিনজন মহিলার কথা মনে আসছে। তারা হচ্ছেন কমাণ্ডার হো যে চুন (কমরেড মাও সে তুংয়ের স্ত্রী), ক্যাং কে চিং (কমরেড চুতে'র স্ত্রী) এবং চ্যাং ইং চাও (কমরেড্ চো এন লাই'এর স্ত্রী), কমাণ্ডার চুন দীর্ঘ লং মার্চের অভিজ্ঞতার পর (যে সময় তিনি নিজে আহত হন এবং তাঁর শিশু কন্যাকে দিয়ে যান এক চাষী পরিবারের কাছে—যার খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি) দশবছর রেড্ আর্মির জীবন যাপন করেছেন। এই

চীনা চাষীর মেয়ে আজ নয়া চীনের অন্যতমা প্রধানা মহিলা। কমরেড্ ক্যাং-এর সঙ্গে চুতে'র যখন সাক্ষাৎ হয় ১৯২৮ সালে তার আগেই তিনি তিন হাজার "উইমেন ভ্যানগার্ড"-এর অধিনায়িকা। সিউয়ান'এর ঐতিহাসিক যুদ্ধে মাত্র দুই ব্যাটালিয়ান সৈন্য নিয়ে কমরেড্ ক্যাং একটা পুরো ব্রিগেড্ জাপানী সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করেন, কমরেড্ ক্যাং পূর্বজীবনে ছিলেন মেষপালিকা—সম্পূর্ণ অক্ষরজ্ঞানহীনা। আজ তিনি ইয়েনান মিলিটারী ইউনিভারসিটির শিক্ষয়িত্রী। কমরেড্ চ্যাং ইং চাও ছিলেন গ্রামের প্রাইমারী শিক্ষয়িত্রী। লং মার্চের সময়ে তিনি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন। সুস্থ হবার পর রেড্ আর্মির অফিসার হিসাবে চীনা রেডক্রশের অধিনায়িকার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

গ্রামের মেয়ে, চাষীর মেয়ে এই চীনা মহিলারা নব জাগ্রতা চীনা মহিলা সমাজের অসংখ্যদের অন্যতমা। নয়া চীনে চাষী মজুরের মেয়ে হাজারে হাজারে আজ রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন। চীনা সাংস্কৃতিক জীবনে এদের দান ও এদের স্থান আজ সর্বজনগ্রাহ্য। তাই হাং সানের গেরিলা সংগীত সমস্ত চীনের জনজাগরণের ছবিকে কথার সুরে জীবন্ত করে তুলেছে :

"ঐ দিগন্তে লাল আভা সোনার গৌরব জাগে
মুক্তির সঙ্গীত জানায় আহ্বান—চলো আগে
সহস্র পর্বত আর শত শত নদীও যেন আজ সার বেঁধে দাঁড়ায়
সৈনিকের মত শক্ত লোহা আর গলন্ত লাভায়,
ঐ শোন মা তার সন্তানকে আহ্বান জানায়
স্ত্রী পাঠিয়ে দেয় তার স্বামীকে যুদ্ধের সজ্জায়
সারা দেশ জাগে আজ নব প্রাণ বন্যায়।
শত্রু আজ যেখানেই আঘাত করুক
সেইখানেই সে তার কবর পাবে
জনস্রোতে আর মুক্তি সেনার নির্মম আঘাতে
তাদের সমাধি হবে।

জনতা আর মুক্তি ফৌজ—মুক্তি ফৌজ আর জনতা—চীনে উভয়ে অঙ্গাঙ্গী

ভাবে মিশে গিয়েছিল। 'জনতা ও লালফৌজ' কবিতার একটি পংক্তি আমি উদ্ধৃত করছি :

"তোমরা লড়ছ লড়াইয়ের পরিখায়, আমি রয়েছি পিছনে
আমরা তোমাদের পরিখা খুড়ছি—আর তৈরী করছি হাতিয়ার।
তোমাদের রক্তের ধারা আর আমাদের পরিশ্রমের স্বেদ
এই মিলিত শক্তির কাছে মাথা নোয়াবে শত্রু নাহি খেদ—"

মহাচীনের প্রত্যেকটি মুক্তিকামী মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছে যে সঙ্গীত, চীনা কিসানের কাস্তের ধারে ধারে ধারালো হয়ে উঠছে যার সুর, হাতুড়ীর আঘাতে আঘাতে শক্ত লোহার মত হয়ে উঠছে যে গানের প্রতিরোধের প্রেরণা, চীনা বুদ্ধিজীবির ভাষাকে যে গান করে তুলেছে জীবন্ত এবং দুর্নিবার—সেই আন্তর্জাতিক মহাসঙ্গীতের চীনা ভাষায় উদ্ধৃতি দেবার আগে "মার্চ অব দি মাঞ্চুরিয়ান ভলান্টিয়ারস"-এর কয়েক পংক্তি এখানে অনুবাদ করছি :

"পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত হয়ে জেগে ওঠো
আমাদের রক্তে আর মাংসে গড়ে উঠবে চীনের নব মহাপ্রাচীর
মহাসংকটে সারা চীন আজ আচ্ছন্ন
এক আওয়াজ ওঠে দেশজুড়ে অবিচ্ছিন্ন—
জাগো, জাগো, জাগো,
লক্ষ কোটি মানুষ আজ সার বেঁধে দাঁড়াও, এক সারে
শত্রুর শত সহস্র কামানের গোলাও যেন তোমাদের—
ভেদ করতে না পারে
চলো আগে, আগে চলো—আগে চল।"

নানকিং সরকার এই গানের লেখক টিয়েন হানকে কারারুদ্ধ করে—এই গান হয়ে যায় বাজেয়াপ্ত। মরণোন্মুখ অবস্থায় শত্রুর কবল থেকে চীনা গেরিলারা তাঁকে মুক্ত করে। মাঞ্চুরিয়ান ভলান্টিয়ার্স'দের মার্চের ইতিহাস হচ্ছে চীনা দুর্ধর্ষ প্রতিরোধ বাহিনীর ইতিহাস—এই গানের প্রতিটি কথা জন্ম নিয়েছে চীনা জনতার অন্তরের অন্তস্থল থেকে। একচেটিয়া মালিকশ্রেণীর আত্মসমর্পন কুৎসীত আকারে যেদিন ব্যক্ত হয়ে পড়েছে, সেদিন এই গান গেয়ে যে মরণজয়ী সেনা-

বাহিনী এগিয়ে চলেছিল, সমগ্র মহাচীনের মহামুক্তিতে সেই জয়যাত্রা সফল সমাপ্তি পেয়েছে।

শিল্পী টিয়েন হান আর মাঞ্চুরিয়ান ভলান্টিয়ার্সের সেনাবাহিনী—কিসান আর মজুরের ছেলেমেয়েরা—কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক মনে এক প্রাণে এই গানের জীবন্ত সুর সৃষ্টি করেছিল। এইখানেই শিল্প সাহিত্যের সার্থক প্রয়োগ এবং সফল প্রগতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চীনা ভাষায় ইন্টারন্যাশানাল সঙ্গীত:

"চিলাইগিক্সান গিয়া ফোদি মুলি
চিলাই চুহান সেজিদ জুয়ির হেন
মান চাংদি র্জি ইগিন্ ফুটাং
জো য়ি জুই সোদি দোজহেঙ্গ
জিন সেজিক দা দি লোকসুয়া লুই মুই
মুলিম চিলাই চিলাই
মো ইয়াও সুয়া-উয়ো মেন ইউয়ান বুজ
উয়োমেন ইয়াও জো চিয়ান সিয়াদ জুরম
জিনস ঝুই সোদি দোজহেঙ্গ
তুয়াঙ্গি চিলাই দাও মিঙ্গ চিয়ান
ইন্টারন্যাশানাল ইয়াও ইয়াও সিয়ান্।"

—শরৎ চ্যাটার্জী

পুস্তক-পরিচয়

রঙরুট—বরেণ বসু, সাধারণ পাবলিশার্স, ৬৪ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা দাম তিন টাকা।

যুদ্ধোত্তর ১৯৪৫ সালে সশস্ত্র নৌ-বিদ্রোহীদের কামান গর্জন অনেকের কাছে আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। প্রধানত যে সশস্ত্র বাহিনীর উপর নির্ভর করে বৃটিশ তার শাসনের খুঁটি বজায় রেখেছিল তার তলায় তলায়ও যে এত বারুদ জমা হচ্ছিল এটা খোদ ব্রিটিশও প্রথম তেমন টের পায়নি।

অসন্তোষ যে শুধু নৌ-বিদ্রোহীদের মধ্যে বিদ্রোহের আকার নিচ্ছিল তাই নয়, সারা সৈন্যবাহিনীও তখন বিস্ফোরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। নৌবিদ্রোহ শুধু তার প্রকাশ্য স্ফুরণ মাত্র। সাম্রাজ্যরক্ষার শেষ ভরসাস্থল যখন কেঁপে উঠল তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধুরন্ধর রক্ষী "তৃতীয়পক্ষীয় সমাজতন্ত্রী" লেবার পার্টির নেতৃত্বে নতুন ভাবে সাম্রাজ্যরক্ষার চক্রান্ত হল—যার স্বরূপ আজ আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

সৈন্য বাহিনীর মধ্যে কী ক'রে বারুদ জমে উঠছিল সেটা জানলে আর সশস্ত্র বিদ্রোহকে আকস্মিক বলে ক'রো মনে হ'ত না। কিন্তু ব্রিটিশ-সৃষ্ট সৈন্য-বাহিনীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা গোপন রাখা সাম্রাজ্য রক্ষার অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হয়ে এসেছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর এমন ভাবে আর আগে কখনো তা নগ্ন হয়ে পড়েনি। রঙরুট সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে লেখা উপন্যাস। অনেক তথ্য এতে পাওয়া যাবে যাতে সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীতে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং ঐ সেনাবাহিনীর মূল দুর্বলতা কোথায় তাও ধরা পড়েছে। সেদিক দিয়ে রঙরুট বর্তমান শান্তি-আন্দোলনে একটা শক্তিশালী অস্ত্রের কাজ করতে পারে।

ব্রিটিশ-সৃষ্ট জমিদারী প্রথার মতই এই সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনী আর একখানা জমিদারী। ধাপের পর ধাপ, অফিসারের নীচে অফিসার তার নীচে অফিসার, সর্বনিম্নে সাধারণ সৈনিক—এই সেনাবাহিনীতে শোষণ এবং শাসন ঠিক পরিপূর্ণ সামন্ত প্রথাতেই চলে। সেনা বাহিনীতে এই সামন্ত প্রথা সারা সাম্রাজ্যবাদী জগতেই চালু আছে। স্বভাবতই সোভিয়েট লাল ফৌজ এবং চীনের মুক্তি ফৌজের চেহারা আলাদা। সেখানে সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করা

মানেই দাসত্ব মেনে নেওয়া নয়, কারণ তারা মুক্তি ফৌজ, জনতার ফৌজ, শান্তি এবং স্বাধীনতা রক্ষার ফৌজ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীতে সৈনিকজীবন আর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস।

রঙরুটের নায়ক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ ছেলে অমল বি-এ পাশ করার পর কোনও চাকুরী না পেয়ে অগত্যা গতযুদ্ধে সেনাদলে যোগ দেয়। অমলের মনে খটকা লাগে, "দেশের লোক তাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে?…কিন্তু বড় বড় কল-কারখানাওয়ালা যারা সেরা সেরা দেশসেবক তারা সমস্ত মূলধন উজাড় ক'রে লড়াইয়ের রসদ তৈরী করছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কেবল তারাই যারা হাভাতের দল। …দেখো, দেশকে স্বাধীন করতে হলে রীতিমত লড়াই করতে হবে। তোমরা যদি সেই লড়াইয়ে কোনোদিন নামো তা'হলে দেখবে আমরা তোমাদের কারও চেয়ে কম দেশভক্ত নই।"

প্রথমেই আই টেষ্টে অর্থাৎ চক্ষু পরীক্ষায় এক টাকা ঘুষ। "যে যার মৌকা নিচ্ছে মশাই, আমরা এসেছি পেটের দায়ে, আর এরা তারই সুযোগে টু পাইস ক'রে নিচ্ছে।" এক এক জন রিক্রুটের জন্য রিক্রুটিং অফিসার পায় তিন টাকা। অফিসার এবং সাধারণ সৈন্যদের মধ্যেকার সংঘর্ষ দেখানোই রঙরুটের উদ্দেশ্য। লেখক তাঁর বাস্তব সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছেন।

এই সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীতে ভর্তি করার সময় কত বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। রিক্রুটিংয়ের সাহেব বলে, "মাইনে ছাড়াও গবর্ণমেণ্ট আপনাদের খাওয়া-পরা, থাকা, চিকিৎসা, ছুটির সময় বাড়ী যাতায়তের টিকিট সবই দেবে… তারপর যখন বেরিয়ে আসবেন তখন গবর্ণমেণ্ট আপনাদের জন্য চাকরী রিজার্ভ ক'রে রেখেছেন।"

এ-হেন প্রতিশ্রুতির পর অমল যখন প্রথম ক্যাম্পে উপস্থিত হয় তখন একজন বলে ওঠে, "ওরে আরো একটা ভেড়া এসে জুটলো রে……" সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের প্রহরী চাপা গলায় বলে, "এখনো পালিয়ে বাঁচতে পারেন, কিন্তু এই খাঁচার মধ্যে একবার ঢুকলে সব শেষ।" আর একজন বলে ওঠে, "ওহে মিস্তির নাও তোমার আর একজন কয়েদী।"

সৈন্যদের লংগরে খাওয়ার সরকারী ব্যবস্থা। কিন্তু তা ছাড়াও একটা বে-সরকারী ক্যান্টিন আছে। যাতে সৈন্যরা পয়সা খরচ ক'রে ক্যান্টিনের খাবার খায় সেজন্য সরকারী লংগরখানার রান্না খারাপ ক'রে করা হয়। মনে রাখা দরকার, খারাপ খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেই নৌবিদ্রোহের সূচনা হয়

"একেবারে ত্রিশক্তি অনাক্রমণ চুক্তি। ক্যান্টিনের মালিক টাকা খাওয়ায় ও-সি'কে। ট্রেনিং ক্যাম্পের কনট্রাকটর খারাপ রান্না চালু রাখার জন্য টাকা দেয় ও-সি'কে। আর আমাদের ও-সি দু'দিক থেকে টাকা খেয়ে খাওয়ার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ কানে তোলেন না। লংগরে খারাপ রান্না ক'রে কনট্রাকটর মোটা টাকা লাভ করে। লংগরের খারাপ রান্নায় বিরক্ত হয়ে ক্যানটিনে এসে ছেলেরা টাকা উজাড় করে দেয়।"

এই খাওয়ার প্রতিবাদ ক'রে একজন প্লেটটা ছুড়ে দিতেই তার শাস্তি হয় পিট্টু প্যারেড অর্থাৎ "একটা স্যাকের মধ্যে অন্তত আধমন ইটপাথর পুরে পিঠের উপর ঝুলিয়ে দেবে—তারপর শুরু হবে মার্চিং। প্রথম কুইক মার্চ, তারপর ডবল মার্চ। তারপর মাথার উপর দু'হাত তুলে ডবল মার্চ।" অথচ ভর্তি করার সময় কত প্রতিশ্রুতি :

"আরে আ যা রঙরুট,
ঘরমে মিলেগা শুখা চাপাটি
ফৌজমে মিলেগা ফ্রুট।
ঘরমে মিলেগা ফাট্টা কাপড়া
ফৌজমে মিলেগা স্যুট
আরে আ যা রঙরুট।"

অমল দেখল কিছু দূরে আরও একটা লম্বা লাইন।

"ওধারে আবার লাইন দিয়েছে কারা?"

"মুসলমানেরা—তাদের আলাদা লংগর কিনা।"

"কেন মুসলমানরা বুঝি আমাদের সঙ্গে খেতে চায় না?"

"মোটেই তা নয়, বরং ওকথা আমাদের বেলায় চলতো!"

"কিন্তু আমরা যে বণ্ডে সই করলাম, জাতিধর্ম নির্বিশেষে একই সঙ্গে থাকতে ও খেতে হবে।"

"বুঝলেন না ওটা হচ্ছে কর্তাদের সুবিধার জন্য। যতদিন ডাইনিং হল তৈরী হয়নি, ততদিন আমরা এক সঙ্গেই খেয়েছি। কিন্তু যেই ডাইনিং হল তৈরী হ'ল, অমনি ধর্মের উপর এদের দরদ উথলে উঠল। জানেন তো এদের ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসি।"

রঙরুটের পাতায় পাতায় মিলিটারী জীবনের অদ্ভুত সামন্ততান্ত্রিক দাসত্বময় জীবনের নানাদিক অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে। অদ্ভুত ডিসিপ্লিন!

রশিদকে তার মাইনের অর্ধেক দেওয়াতে প্রতিবাদ করতে যেতেই, "কোয়ার্টার গার্ড থেকে দু'জন সেন্ট্রি এসে চেপে ধরল, হাবিলদার সাহেব পেছন থেকে ঘাড়ে ধাক্কা দিতে লাগল। কোয়ার্টার গার্ড আমার হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে দিলো। তারপর এলো জমাদার দাস গুপ্ত। কোন কথা না বলে আমার গালে চড় বসিয়ে দিলো। তারপর এলেন মেজর সাহেব। তিনি আমাকে দাঁড় করিয়ে পেটে এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন। দম আটকে আমি লুটিয়ে পড়লুম। মেজর সাহেব বুটশুদ্ধ পায়ে লাথি মেরে আমায় একধারে সরিয়ে চলে গেলেন।......আমার আটাশ দিন জেল হলো।"

এমনি ধরনের অত্যাচারের সীমা নেই। কথায় কথায় 'ফেটিগ' খাটানো, 'আর আই' দেওয়া অথবা 'কোয়াটার গার্ডে' পাঠানো। কোয়াটার গার্ডের মানে হল ক্যাম্পের জেলখানা। কোয়াটার গার্ডের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে, ট্রেনে ক'রে সৈন্য নিয়ে যাবার সময়ও ট্রেনের একটা কামরাকে কোয়াটার গার্ড হিসেবে রাখা হয়।

চুল ছাটাইয়ের ব্যাপারেও অফিসারদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। এমন কি ফুটবল খেলার মাঠে পর্যন্ত সাধারণ সৈন্য এবং অফিসারের সংঘর্ষ ফুটে বেরোয়। এক-জন সৈনিক অন্য একজনকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে, "উনি সুবেদার সাহেব। আপনার সাহস ত কম নয়, খুব চার্জ করছিলেন।"

কিন্তু কোন অত্যাচারেরই প্রতিকার নেই। মিলিটারী ডিসিপ্লিন আজ্ঞাবহ দাসের মত পালন করতে হবে। এই ডিসিপ্লিন সম্পর্কে জনৈক হাবিলদার চমৎকার বক্তৃতা দেয়, "ডিসিপিলিন কা বারেমে লেচকর। সিরফ দোবাত। পহেলি বাত।—হুকুম মানো। হুকুম মাননেকা তরিকা ক্যা হায় ? কান খুলো—মত্‌লব্ গওরসে হুকুম শুনো। আখ খুলো, মতলব, আচ্ছা সে দেখ কর, আপনা কাম সমঝ্ লেও। মুহ্ মত্ খুলো—মত্‌লব্, কভি কোইভি কাম ইন্‌কার মত করো। দুসরী বাত, ফৌজমে কভি কিসিকো সাথ্ ভাই বন্দী মত্ করো।"

অমল এই অফিসারী ডিসিপ্লিনের প্রতিবাদ না করে পারে না। নানা ঘটনায় মধ্যে দিয়া অমলের মধ্যে নেতৃত্বের সূচনা দেখা যায়, যদিও তা পূর্ণ বিকশিত হতে পারে নি।

একজন সৈন্য বলে, "ঠিক বলেছেন অমলবাবু ওরা আমাদের মানুষও মনে করে না। আবার পশুও মনে করে না।

"আমরা তবে কী ?"

"আমরা ক্রীতদাস।"

অমল কয়েকটা গভীর সত্য উপলব্ধি করে। অমল বলে : "অথচ কনস্ক্রিপসনের জোরে আমাদের টেনে আনে নি। বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে যে ফাঁদ এরা সৃষ্ট করেছে ঘুরে ফিরে সেই ফাঁদের মধ্যে পড়তেই হবে। কিন্তু এই ফাঁদের মধ্যে ধরে রাখতে গেলে আমাদের পশু করে রাখতে হবে—না হ'লে আমরা সে ফাঁদ কাটবার চেষ্টা করব।"

এর বিরুদ্ধে ঘনিয়ে ওঠে আক্রোশ, একটু একটু ক'রে জমে বিদ্রোহের জ্বালা। সেটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য অফিসারেরা মাঝে মাঝে ভিন্ন পথও গ্রহণ করে। যেমন মেজর রায় বক্তৃতা দেন, "তোমরা সকলেই আমার ছেলে। তোমাদের মত আমারও এক ছেলে আজ মিলিটারিতে।...তোমাদের কোন কষ্ট হলে তা আমাকেই বাজে বেশী।" একটু পরেই ঐ মেজরের ঘুঁষিতে জয়ন্তের মুখ ফেটে দরদর ধারায় তাজা রক্ত বেরিয়ে আসে।

কাজেই নির্যাতীত সৈনিকদের কাছে ওসব ভাঁওতা চলে না। ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে সৈন্যরা অফিসারদের বিরুদ্ধে তেজের সঙ্গে সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়ায়। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সৈনিকরা একতাবদ্ধ হ'তে চেষ্টা করে। পূজার উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে এমনি চেষ্টা চলে। মাঝে মাঝে অফিসার বদল হয়, বাঙালীর পরিবর্তে খাস ইংরেজ আসে, আবার রঙ্গ-ভূমিতে মার্কিনদেরও দেখা যায়। কিন্তু সৈনিকরা বুঝতে শেখে অফিসারদের কোনো জাত নেই। বৃষ্টি পড়ছে হয়ত, তা দেখে একজন সাধারণ সৈনিকের মুখ দিয়ে বের হয় "এই শালা বৃষ্টি যেন এন-সি-ও-দের চাইতেও অসহ্য।"

শেষ দৃশ্যে দেখা যায় অসহ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সৈনিকদের মধ্যে কীভাবে তীব্র দেশপ্রেম জেগে উঠেছে, জেগে উঠেছে সংগ্রামের সাড়া, হিন্দু-মুসলিম এক সঙ্গে। এই সৈন্যবাহিনীকে দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কেটে দু'টুকরো করা হয়েছে।

এ কথা ঠিক যে, সৈনিকদের মধ্যে নব চেতনা জাগ্রত হওয়ার সমূহ কারণ-গুলো উপন্যাসে দেওয়া হয়নি. সোভিয়েট এবং লালফৌজের প্রভাব আরো ব্যক্ত করার সুযোগ ছিল, জটিল আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থার হয়ত যথাযথ চিত্র দেওয়া হয় নি। দ্বিতীয়ত, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সংঘর্ষের যে চিত্র বরেন বাবু এঁকেছেন সেটা যদি আরো আবেগের সঙ্গে আঁকতেন তা'হলে সাধারণ সৈনিকদের বিপ্লবী ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠত। তৃতীয়ত, বইটাতে সত্যিসত্যি

'পজেটিভ হীরোর' অভাব। আশা করা গিয়েছিল, অমলকে হীরো হিসাবে উত্তীর্ণ দেখা যাবে, জয়ন্তের চরিত্র সম্পর্কেও ঐ কথা আরও বেশী খাটে। ১৯৪৫ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রমাণ করেছে, বাস্তব জীবনে তখন সৈন্যবিভাগে 'পজেটিভ হীরো' দেখা দিতে শুরু করেছে। তবে লেখক কেন জয়ন্তকে আরও বাড়তে দিলেন না? তাতে বিদ্রোহের রূপ আরও ঘনিভূত দেখানো যেত, বিপ্লবী-প্রেরণা জোগাবার ক্ষমতা আরও বাড়ত, বইখানা আরো নিখুঁত হত। আমার মনে হয়েছে, লেখক অমলজয়ন্তের উপর এবং তাঁর নিজের সাহিত্যিক ক্ষমতার উপরও একটু অবিচার করেছেন। কিন্তু এসব সত্বেও রঙরুট প্রচণ্ড শক্তিশালী লেখা, যে রকম অনাড়ম্বর ভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য ফুটে উঠেছে তাতে লেখকের শিল্পীজনোচিত সংযম মুগ্ধ করে।

যে অপূর্ব শিল্প দক্ষতার সঙ্গে বরেনবাবু সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীর অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেকার প্রকৃত দাস-প্রভু সম্পর্ক নগ্ন করে তুলে ধরেছেন এবং সৈনিক-জীবনের ক্ষতচিহ্নগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে শান্তির সৈনিকরা এ বই ব্যবহার করতে পারবেন যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের সৈন্যভর্তির বিরুদ্ধে।

মোকাবিলা—শ্রীদিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পুস্তকালয়, ২৯, রামানন্দ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ —দাম এক টাকা বারো আনা।

মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্কীর্ণ অস্তিত্ব ভেঙ্গে প্রচণ্ড বেদনার মধ্য দিয়ে এক নতুন সংগ্রাম ঝিলিক দিয়ে উঠছে। ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে ঐক্যের জয়গান মুখে নিয়ে বেরিয়ে আসছে এক নতুন মানুষ এবং সেই মনুষ্যের মোহমুক্ত চেতনা। থরথর আবেগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ শ্রমিক-কৃষকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, ঐ দিকেই আশা, ঐ দিকেই সম্ভাবনা। সমস্ত ভুল ত্রুটি আগুনের অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ হবে। জয় হবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, জয় হবে সংগ্রামের; জয় হবে বিক্ষুব্ধ মানুষের। ক্ষেপা কুকুরের মত দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে প্রতিক্রিয়ার দমন নীতি আরো তীব্র, আরো মারমুখো হয়ে ওঠে। খ্যাতনামা নাট্যকার দিগিন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় চুপ করে থাকতে পারেন নি। এই প্রচণ্ড ভাঙাপড়ার দিনে ব্যবসায়ী নাট্যকারদের লৌহ যবনিকা ভেদ করে প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তিনি, দমননীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন তাঁর জ্বালাময়ী লেখনি। পুরাতনের মধ্য থেকে যে নতুন বেরিয়ে আসছে তাকে দিগিনবাবু সম্মান

দিয়েছেন, বিশ্বাস দিয়েছেন, দেখিয়েছেন মধ্যবিত্ত সংসারে ভাঙনটাই বড় কথা নয়, তেজের স্ফুলিঙ্গ সেখানে আর পুরনো গণ্ডির মধ্যে বাঁধা থাকতে চাইছে না। মোকাবিলা করতে চাইছে অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর সঙ্গে। এই মোকাবিলার অবশ্যম্ভাব্যতা, এই সংঘর্ষের বেদনা-আনন্দ এবং সংঘর্ষের মধ্যে জাগৃত সাধারণ মানুষের শক্তি ও মহত্বকে দিগিনবাবু বড় ক'রে এঁকেছেন।

মানুষকে ছোট করে দেখাটা মালিকশ্রেণী এবং শাসকশ্রেণীর অস্থিমজ্জাগত —অর্থনৈতিক সংকটে ফেলে তোমার মেরুদণ্ড আমি বেঁকিয়ে দেব, আর দমন-নীতি চালিয়ে তোমার প্রতিরোধকে আমি চূর্ণ করব! কিন্তু নিরীহ বিশ্বনাথ বাবু এবং তাঁর পরিবার সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন। এই মোকাবিলাই দেশের কোনে কোনে ছড়িয়ে পড়ছে। মেরুদণ্ড বেঁকে যাচ্ছে না, আঘাতে আঘাতে বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠছে। মানুষ ছোট নয়, মানুষ বড়। আর এই মহান্ সংগ্রামে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে যে সংগ্রামী লেখক তার লেখনি শক্তিও বড়।

মালিকশ্রেণীর মত মালিকশ্রেণীর লেখকরাও এই সাহিত্যকে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও তারা ব্যর্থ হবে। আদর্শগত আক্রমণ ক'রে বা দমননীতি দিয়ে এই সাহিত্যকে ছোট করা যাবে না। পিষে মারা যাবে না! দিগিন বাবুর এটি ষষ্ঠ নাটক, তাঁর প্রতিভা এবং লিপিকুশলতা এবং সামাজিক জটিলতা ফোটাবার ভঙ্গী আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শাসকশ্রেণীর দমননীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তিনি বলিষ্ঠতম কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন। প্রগতি শিবিরের লোকদের এই নাটক ব্যবহার করতে হবে।

মোকাবিলা লেখার পর গত কয়েকমাসে দমননীতি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে—যতই সংগ্রাম তীব্রতর রূপ নিচ্ছে। তেলেঙ্গানায় আটজন কৃষক বীর নেতাকে আদালতে প্রকাশ্য বিচারের সুযোগ না দিয়ে ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হয়েছে। রাজসাহী জেলে গুলি চলেছে। বাংলা দেশের বন্দীদের বক্সায় পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলেছে। আর দাঙ্গা বাধিয়ে অভিনব আকারে দমননীতি চালানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্য চাই, সাহস চাই, উৎসাহ চাই। এই পথে মোকাবিলা হাতিয়ারের কাজ করুক।

—গোলাম কুদ্দুস

লেখকদের প্রতি

আজ প্রায় চার মাস ধরে দাঙ্গার আগুন জ্বলছে সারা বাংলায়। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত বাংলার এপারে ওপারে চলেছে নৃশংসভাবে গরীব সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে, একই বাংলার দুই অংশের মধ্যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা আসন্ন যুদ্ধের বিষাক্ত অপপ্রচারে জনমত বিভ্রান্ত। চটকল-চাবাগানের ইংরেজ মালিকের মুখপত্র স্টেট্‌স্‌ম্যান ও টাটা-বিরলা-ইস্পাহানীর নির্দেশে চালিত দেশী সংবাদপত্রগুলিতে চলেছে মিথ্যার নির্লজ্জ বেসাতি। রোজ হাজারে হাজারে ভীত, আর্ত, অসহায় নরনারী ওপার থেকে এপারে আসছেন, এপার থেকে ওপারে চলে যাচ্ছেন। একটা লোক-দেখানো, লোক-ঠকানো শান্তির চুক্তি হয়েছে ইংরেজ-আমেরিকানদের বাণিজ্যিক স্বার্থে; সাধারণ মানুষ এতে ভরসার চেয়ে ভয় পেয়েছে বেশী। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারী দাঁড়িয়েছে স্বধর্মীর দ্বারপ্রান্তে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে। সেবার নামে, সাহায্যের নামে, পুনর্বাসনের নামে উদ্বাস্তু-শিবিরগুলোতে চলেছে মুনাফাশিকারী ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের নারকীয় তাণ্ডব। কলকাতার শিল্পাঞ্চলে মুসলমান মজুরদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল ও যাচ্ছে তার নৃশংসতা ও নারকীয়তা অবর্ণনীয়। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে, বিশেষত সীমান্ত অঞ্চলে—যেখানে মুসলমান চাষীর ঘন বসতী—সে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষ ও চাষীর অভাবে পশ্চিম বাংলায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ। সংখ্যালঘুর প্রতি নৃশংসতার প্রতিযোগিতায় কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারেও না।

দাঙ্গা কারও খেয়াল খুশীতে বাঁধেনি, বাঁধতে পারে না। দাঙ্গা বাধিয়েছে কারা? দাঙ্গা বাধিয়েছে চটকল-চাবাগানের ইংরেজ মালিকেরা, দাঙ্গার পেছনে আছে আমেরিকানরা, আছে টাটা-বিরলা ইস্পাহানীর দল, আছে গ্রামাঞ্চলের জমিদার-জোতদারের পাল। দাঙ্গার ইন্ধন জুগিয়েছে এদেরই দালাল সংবাদপত্র, রেডিও, কংগ্রেস ও লীগ। এদেরই শোষণে ও শাসনে যখন মজুর, চাষী ও মধ্যবিত্তের প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম, তখন তারা বেপরোয়া বিক্রমে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল। মজুর চেয়েছিল বাঁচবার মত মজুরী ও স্বাধীনতা, চাষী

চেয়েছে জমি, মধ্যবিত্ত চেয়েছিল তার বৃত্তিকে ও ব্যবসাকে বুক দিয়ে বাঁচাতে। এরা সবাই চেয়েছিল তৃতীয় যুদ্ধের প্রলয়ংকর বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে। জাতীয় মুক্তির এই গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার আতঙ্কে মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল সাম্রাজ্যবাদীরা। বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও বিনষ্ট করতে চাইল তারা এই গণ-অভ্যুত্থানকে। দাঙ্গা হচ্ছে এর সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার। মেহনতী মানুষের এক অংশের মন অপর অংশের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করে কৌশলে নিজের গা বাঁচিয়ে দাপটে শাসন চালিয়ে যাওয়া—অর্থাৎ ডিভাইড এণ্ড রুল—ইংরেজের চিরাচরিত নীতি। এই নীতির ফল দেশবিভাগ, এই নীতির ফল আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি।

এই দাঙ্গা আজ আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় সোশাল রিয়ালিটি বা সামাজিক বাস্তবতা। আমাদের লেখকেরা অধিকাংশই গরীব ঘরের লোক। দাঙ্গায় তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ভাবে, শ্রেণীগত ভাবে বিপন্ন। বিপন্ন তাঁদের প্রাণ, বিপন্ন তাঁদের বিত্ত, বিপন্ন তাঁদের প্রিয়জন। সাম্রাজ্যবাদ আজ নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে লেখকদের সামনে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা সাহিত্যের উদ্দেশ্য বা উৎকর্ষ নিয়ে অবাস্তব বিতর্কবিলাসের অবকাশ রাখে নি। আজ যে লেখক তাঁর রচনায় দাঙ্গার ইন্ধন জোগাবেন বা দাঙ্গা সম্পর্কে নীরব থাকবেন, ভবিষ্যৎ নয় বর্তমানই তাঁকে ক্ষমা করবে না। এক লহমায় সাধারণ মানুষের চোখে তাঁর চেহারা উদ্‌ঘাটিত হবে। কোন মুখোশেই তিনি গোপন রাখতে পারবেন না, তিনি কোন শিবিরের লোক। যেমন, এটম বোমা ও তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে যে লেখক মুখ না খুলবেন তাঁকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ ক্ষমা করবে না। সোভিয়েট লেখক ইলিয়া ইরেনবুর্গ ইংরেজ লেখক প্রিস্টলিকে বলেছিলেন, আণবিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে তুমি যদি কথা না বল, আমাদের (শান্তির) আবেদনে তুমি যদি স্বাক্ষর না দাও, তবে তোমার মস্কো, লণ্ডন ও নিউ ইয়র্কের পাঠকেরা তোমাকে ক্ষমা করবে না। সোভিয়েট লেখকের এই সতর্কবাণী আমাদের বিশেষ স্থানীয় পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী লেখকদের প্রতিও প্রযোজ্য। তাঁদেরও আজ দল, মত, সম্প্রদায় নির্বিশেষে দাঙ্গার বিরুদ্ধে, দাঙ্গাবাজের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে হবে। অনেক সাহিত্যিকের মধ্যে আমরা আত্মবিশ্বাসের অভাব লক্ষ্য করেছি। তাঁরা ভেঙ্গে পড়ছেন এই ভেবে যে, এই সাংঘাতিক বিপর্যয়ের মুখে লেখা দিয়ে কতটুকু কী করা যাবে। তাঁদের মনে রাখতে হবে সাহিত্যের

ও সাহিত্যিকের শক্তি অপরিসীম। মনে রাখতে হবে, গর্কিকে কেন হত্যা করা হয়েছিল, মায়াকোভস্কিকে কেন বাধ্য করানো হয়েছিল আত্মহত্যায়, কেন আজ তুর্কী কবি নাজিক হিকমত কারাগারে, কেন আজ হাওয়ার্ড ফাষ্টের মাথার উপর রাজদণ্ড ঝুলছে ? কেন আমাদের কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের 'নানকিং' কাব্য-গ্রন্থকে দফ্‌তরীবাড়ীর সূতিকাগারে গলা টিপে হত্যা করা হয় ? কোন্ শক্তিতে অমরেন্দ্র ঘোষের সামান্য একখানি ছোট উপন্যাস 'চরকাসেম' তারকেশ্বরের নিকটবর্তী কোনো গ্রামের দাঙ্গাবাজদের মুখ ও হাত বন্ধ করে দিতে পারে। লেখকেরা বিশেষ জাতের লোক। আবেগ ও বুদ্ধির সঙ্গে প্রকাশচাতুর্যের সংমিশ্রণে সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁদের চেহারা স্বতন্ত্র। তাই সাধারণ মানুষের মনের মোড়্ ফেরাতে তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। তাঁদের সামাজিক দায়িত্বও তাই আজ সবচেয়ে বেশী। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ শাসিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকৃতি ও ব্যভিচারের যে কদর্য নারকীয় রূপ আজ দাঙ্গার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে, তার বিচিত্র রূপকে বিচিত্র রূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে আমাদের লেখকদের। ফুটিয়ে তুলতে হবে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, স্পর্শগ্রাহ্য করে এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের দুঃসাহসী প্রতিরোধকে, গণতান্ত্রিকতার নির্মল ধারাকে। কাব্যে, গানে, নাটকে, উপন্যাসে চিত্রিত করে তুলতে হ'বে সম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের বিরুদ্ধে অতীত ও বর্তমানের হিন্দু-মুসলমানের সমস্ত মিলিত লড়াইকে। মনে রাখতে হবে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সক্রিয় নির্মম প্রতিরোধই আজকের প্রগতি-সাহিত্যের মূল সুর। কারণ, দাঙ্গার প্রতি নিষ্ক্রিয় বিরাগ ও দাঙ্গাবাজদের প্রতি উদার ক্ষমা পরোক্ষে গোপনে দাঙ্গারই ইন্ধন জোগায়, শক্তিশালী করে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের হাত। সাহিত্যিকদের দাঙ্গা প্রতিরোধে এই ভাবধারার সঙ্গে কোন আপস চল্‌বে না।

—সরোজকুমার দত্ত

সংস্কৃতির উপর আঘাত

ইদানিং সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত বই ও সাময়িক-পত্রের আমদানীকারী, প্রগতিশীল পুস্তক ব্যবসার উপর দিন দিন পুলিশ হামলা বেড়ে চলেছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ পেয়েছে। মস্কো থেকে প্রেরিত বই ও সাময়িক পত্রের অজস্র প্যাকেট পুলিশ দপ্তরের বিশেষ বিভাগের লোকেরা মাসের পর মাস আটকে রেখে দেয়। এর মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান ও বিখ্যাত সাময়িক পত্র নিউ টাইমস ও মাসিক সোভিয়েট লিটারেচর এবং মার্কস-এঙ্গেলস্‌, লেনিন, স্টালিন, গর্কী, বেলন্‌স্কী, দব্রোলিয়বভ, লাইসেঙ্কো, ইবেনবুর্গ, এবং অন্যান্য প্রখ্যাত লেখকদের বই থাকে। এই অবস্থায় প্রতিদিন অসংখ্য গ্রাহক ও পাঠককে অসুবিধা ভোগ করতে হয়। অথচ বই ও সাময়িক পত্র আমদানী করবার কোনটারই উপর শুল্কের বাধানিষেধ নেই। ভারতবর্ষ ও সোবভয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ, এই দুই দেশের মধ্যে ব্যবসার উপরও কোন বাধানিষেধ নেই। ভারত সরকার প্রতিদিন অত্যন্ত জোর গলায় বলেন যে সোভিয়েটের মতাদর্শের সাথে তাদের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু এই ব্যাপারে পেছন দিক থেকে চিন্তার ও জানবার সুবিধা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কেন ?

দুঃকারজনক ও উষ্মাপূর্ণ পুলিশী হয়রাণীর ফলে প্রগতিশীল পুস্তক-ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে।

কলকাতার অসংখ্য স্টলে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত (কার্যত সোভিয়েট বিরোধী) সাময়িক পত্রের চলতি সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। অথচ অত্যন্ত অল্প পরিমাণেই সোভিয়েটের বই ও সাময়িক পত্র পাওয়া যায়। তার উপর যারাই এই কাজে উদ্যোগী হন, তাদের এই ধরনের পুলিশী হয়রানিও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে।

প্রতি সভ্য দেশে স্বীকৃত মূল নাগরিক অধিকার বিরোধী এই কাজ দিনের পর দিন সমাজে চলেছে, ভারতবর্ষের নতুন শাসনতন্ত্রেও এই অধিকার লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংবাদ পত্র ও জনসাধারণের এই অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য এগিয়ে আসতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে।

—দুলাল গুপ্ত

ত্রুটী স্বীকার

"অগ্নিগর্ভ" পুস্তকের প্রকাশকের নাম "নিউ সেঞ্চুরী পাবলিশার্স"-এর স্থলে ভ্রমক্রমে শুধু "সেঞ্চুরী পাবলিশার্স" ছাপা হইয়াছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

কাঃ পঃ

বিজ্ঞপ্তি

টাকা, চেক, ড্রাফট্, পোস্টাল অর্ডার, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্র নীচের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজনীয়রূপ ডাক টিকিট না পাঠাইলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হইবে না।

কম পক্ষে দশ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপির জন্য এক টাকা করিয়া জমা রাখিতে হইবে। আগামী বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে গত মাসের বিলের টাকা শোধ করিতে হইবে। এজেন্টদের শতকরা ২৫ টাকা কমিশন দেওয়া হইবে। প্রতি সংখ্যায় ৫০ কপির বেশী এজেন্সী নিলে শতকরা ৩০ টাকা কমিশন দেওয়া হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

চাঁদার হার ঃ—

সডাক বার্ষিক—৬৲ টাকা
সডাক ষাণ্মাষিক—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা—॥০ আনা

কার্যাধ্যক্ষ—পরিচয়
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

পাঠকদের প্রতি

"পরিচয়"এ প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পুস্তক-পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে সমালোচনা চাই। সমালোচনা যেন গঠনমূলক হয়, যাতে নতুন গণতান্ত্রিক সাহিত্য আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে "পরিচয়" এগিয়ে যেতে পারে। সমালোচনা, আত্মসমালোচনাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এই ব্যাপারে আমরা পাঠকদের আন্তরিক ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা কামনা করি।

সম্পাদক
পরিচয়

পুরাতন পরিচয়

প্রথম সংখ্যার সূচী

সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের আহ্বান ॥ আমাদের লেনিন ॥ স্টালিন জিন্দাবাদ ॥ গোর্কির 'মা' ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ॥ "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) ॥ পাবলো নেরুদা ॥ যুদ্ধবাদীদের 'শান্তিবাদী' ভণ্ডামি ॥

দ্বিতীয় সংখ্যার সূচী

গণরাষ্ট্রগুলিতে সাংস্কৃতিক জয়যাত্রা ॥ জোয়ার ॥ সাহিত্যে তথাকথিত 'তৃতীয় শিবির' ॥ বনফুলের মানদণ্ড ॥ জঙ্গীবল্লম ॥ ঝড় ॥ আমেরিকার প্রগতি সাহিত্যের সমস্যা ॥ অর্ধশতাব্দী ॥ অনশন বন্দী ॥ চিঠিপত্র ॥

তৃতীয় সংখ্যার সূচী

বিজ্ঞান ও শান্তি ॥ বিচার ॥ তিনজন ॥ 'সাক্ষাৎ যমে'র যমপ্রাপ্তি ॥ "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" (সীতাংশু মৈত্র) ॥ চীনের সাহিত্যে ও শিল্পে সংযুক্ত ফ্রণ্ট ॥ এই দাঙ্গা ॥ জেগে আছি ॥ নতুন শাসনতন্ত্রে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ॥ সিনেমা সমালোচনা ॥

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক নিউ মদন প্রেস, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও ৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

মে-জুন ১৯৫০ নব পর্যায় : ৫ম সংখ্যা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

দাম : আট আনা

এপথে ক্রেমলিন থেকে একটি আলোর জ্যোতি
রক্তবর্ণ আগ্নেয় আভায় ঠিকরে বেরিয়ে আসে।
আমি সেই লাল রশ্মি চোখে-মুখে সর্ব অংগে জড়িয়ে নিলাম।
ফ্রান্সে-বৃটেনে-ব্রহ্মে, মাঞ্চুরিয়ার ঢেউ খেলা পাহাড় প্রান্তরে,
ইটালী-গ্রীস ও চেকে
কুলী কর্মী কেরানীর বলিষ্ঠ সবল হাতে
শিল্পীর তুলির টানে একটি প্রতীক-আঁকা
আমার শান্তির ঝাণ্ডা উর্ধ্বাকাশে উড়িয়ে ছিলাম।

—ধনঞ্জয় দাশ

নরমাংসলোলুপদের প্রতি

এখন সুদিন তোমাদের ;
শ্মশানের একচ্ছত্র সম্রাট শকুন
শিয়াল প্রহরী, শুধু বাদে পোড়া তালগাছের নিস্পৃহ চূড়োয় ব'সে
শোকাশ্রু বর্ষণ, শুধু এ চিতাচুল্লীর পাশে প্রহরে প্রহরে হাঁক পেড়ে
শ্মশানের শান্তিরক্ষা কাজ।
এখন সুদিন তোমাদের ;
ফিরিঙ্গি হোটেলে গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় চল বিদেশী বণিক
সিল্কের রুমালে নাক চেপে
(ধরুন রামধুন এসে সেখানে রাজ্যপাল পরম বৈষ্ণব),
উজির-এ আজম তোমরা যুদ্ধ থেকে শান্তির শাখায়
দিল্লী থেকে কলকাতায়
ঢাকা থেকে করাচির লম্ফাপার ঘনঘন
উল্লাভুল লম্ফঝম্প সেরে
প্রাতরাশে কিংবা প্রতি বৈকালিক বাগানপার্টিতে
টাটকা ফল, কেক, মিষ্টি, শাড়ির মদির ভিড়ে
টাটকাতর খবরেই রসসিক্ত কর খর নরমাংসলোলুপ রসনা।
এদিকে শ্মশানচুল্লী জ্বলন্ত কলকাতা ঢাকা
তোমাদের চক্রান্তের বিষধর ফণা,
কাল যারা প্রতিবেশী আজ তারা শত্রু পরস্পর,
দুই বাংলা বাস্তুহারা, একবস্ত্রে রাস্তার ভিখিরী,
আসমুদ্র হিমাচল মর্মভেদী আর্তনাদ, বিলাপের একটানা আওয়াজ।

শয়তান সম্রাটশ্রেষ্ঠী, সাম্রাজ্যস্বার্থের হাটে হাটে
দেশকে বিকিয়ে দিলে কানাকড়ি দামে ?